Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বিনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসিদ শারমিন

রোলঃ 23090120012

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বিনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসিদ শারমিন

রোলঃ 23090120012

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেক্যুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বিনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাসিদ শারমিন, আইডিঃ 23090120012 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সেক্যুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বিনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

নাসিদ শারমিন

আইডিঃ 23090120012

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
সেক্যুলারিজমের ধারণা 7
ইসলাম কি? 11
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 15
ইসলামি ভূখণ্ডে সেক্যুলারিজমের ব্যর্থতা 30
সেক্যুলারিজম ও ইসলামের দ্বন্দ্ব 33
মানদণ্ড নির্ধারণ 40
সেক্যুলারিজমের ইসলামিকরণ কি আদৌ সম্ভব? 44
সেক্যুলারিজমের ক্ষতিকর দিক 49
দ্বিনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ 54
করনীয় ও বর্জনীয় 57
উপসংহার 62
তথ্যসূত্র 64

ভূমিকা

সমসাময়িক পৃথিবীতে ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে যে আলোচনাগুলো সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে, তার অন্যতম হলো সেক্যুলারিজম নামক মতাদর্শ। সেক্যুলারিজমের মূল দাবি—ধর্মকে জনজীবন থেকে পৃথক রাখা—মুসলিম সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং বহু ক্ষেত্রে ইসলামের স্বাভাবিক ও সামগ্রিক ধারণাকে সংকুচিত করে ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। এই মানসিক ও দার্শনিক পরিবর্তন মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে; ফলত, ইসলাম কি কেবল ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুশীলনের নাম, নাকি মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে নির্দেশনাসম্পন্ন এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ—এই প্রশ্ন নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে।

এই গবেষণার মূল আলোচ্য হলো সেক্যুলারিজমের ধারণা, তার উৎপত্তি, তার ভাষাগত ও দার্শনিক ভিত্তি, এবং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এর অবস্থান। বিশেষ করে দেখা গেছে যে সেক্যুলারিজম শব্দটি ভুল অনুবাদ, ভুল ব্যাখ্যা ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে মুসলিম সমাজে "ধর্মনিরপেক্ষতা" নামে গ্রহণ করা হয়েছে, অথচ মূল ধারণাটি ধর্মহীনতা, ধর্মবিমুখতা এবং ধর্মকে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে অপসারণের চিন্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে। ব্রিটানিকা, ওয়েবস্টার, অক্সফোর্ডসহ আন্তর্জাতিক অভিধানগুলো সেক্যুলারিজমকে যে অর্থ দেয়, তা স্পষ্টভাবে ধর্মকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতাকেই নির্দেশ করে; এবং এ প্রক্রিয়া পশ্চিমা খ্রিস্টীয় মধ্যযুগের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সমস্যার প্রেক্ষিতে জন্ম নিয়েছিল।

কিন্তু মুসলমানদের কাছে ধর্মের ধারণা পশ্চিমা অভিজ্ঞতার মতো নয়। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান নয়; বরং একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এমন এক সমন্বিত জীবনব্যবস্থা। ইসলামে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, নৈতিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা—সবই একটি ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসেবে বিবেচিত। ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ধর্মকে পৃথক করা ইসলামের মৌলিক কাঠামোকে অস্বীকার করার নামান্তর। গবেষণাটি দেখিয়েছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং আইন—সবই একই বিশ্বাস ও কর্তৃত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ কারণে ইসলামে আল্লাহর বিধানের অধীনতা শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের বিষয় নয়; বরং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশকে মান্য করা অপরিহার্য।

গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয়েছে যে সেক্যুলারিজম শুধু রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ধর্মকে বাদ দেয় না; বরং ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, চিন্তা ও আচরণেও প্রভাব ফেলে। এর ফলে আমরা দেখতে পাই—একদিকে মানুষ নামাজ, রোজা পালন করছে; আবার অন্যদিকে

এমন পেশা বা কার্যকলাপ গ্রহণ করছে, যা ইসলামের নীতির পরিপন্থি। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ধর্মীয় আচরণ বজায় রেখেও আল্লাহর নির্দেশকে জীবনের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। গবেষণাটি দেখিয়েছে যে এই প্রবণতা সেক্যুলারিজমেরই এক সূক্ষ্ম প্রভাব।

এ গবেষণার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো- সেক্যুলারিজমের তাত্ত্বিক কাঠামো, এর প্রকৃত অর্থ, পশ্চিমা ঐতিহাসিক পটভূমি এবং ইসলামি শিক্ষার সাথে এর সংঘাতকে বিশ্লেষণ করা; পাশাপাশি মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে এর ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যায়ন তুলে ধরা। এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইসলামের সামগ্রিকতা—একটি এমন তত্ত্ব যা বলে যে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো মানবনির্মিত আইন, মূল্যবোধ বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হিসেবে গ্রহণ করা ইসলাম স্বীকার করে না।

ফলত, এ গবেষণা কেবল সেক্যুলারিজমের সমালোচনা নয়; বরং মুসলিম পরিচয়, রাষ্ট্রচিন্তা, মূল্যবোধ এবং জীবনব্যবস্থার মূলনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা।

সেক্যুলারিজমের ধারণা

সেক্যুলারিজম শব্দটি ইংরেজি Secularism এবং ফরাসি Secularité বা Laïque থেকে উদ্ভূত; বহু অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় এর অর্থ বার্তালাপে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। সেক্যুলারিজম—শব্দগত ও ব্যবহারগতভাবে—ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মহীনতা বা পার্থিবতাকে নির্দেশ করে; কিন্তু অনুবাদকারীদের সাংস্কৃতিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি পশ্চিমা খ্রিস্টীয় প্রেক্ষাপট হওয়ায় অনুবাদের ক্ষেত্রে ধরণের ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ যে—জ্ঞান/বিজ্ঞান শব্দের সঙ্গে সেক্যুলারিজমের অপরিহার্য সংযোগ নেই; ইংরেজি/ফরাসি ভাষায় বিজ্ঞান এবোঝাতে আলাদা শব্দ (Science, Scientifique) ব্যবহৃত হয়। অতএব সেক্যুলারিজমকে কেবল 'বিজ্ঞানবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করা সঠিক নয়।

শব্দার্থ ও অনুবাদ বিষয়ক পর্যবেক্ষণ

আরবি ভাষার শব্দগঠন সংক্রান্ত কিছু দিক এখানে আলোকপাতযোগ্য: সাধারণত আলিফ ও নুন বৃদ্ধি করে নিসবত (সম্পর্ক) বোঝানো হয় না; কিছু ব্যতিক্রম আছে—উদাহরণ: রাব্বানি; পরে যুগে রুহানি, নুরানি প্রভৃতি শব্দব্যবহার বেড়েছে। আধুনিক লেখকদের মাঝে আকলানি, শাখসানি, ইলমানি ইত্যাদি প্রয়োগ লক্ষ করা যায়; কিন্তু সেক্যুলারিজম শব্দটি আরবিতে অনুবাদ করলে 'ধর্মহীনতা' বা 'পার্থিবতা'—এরূপ একটি যথার্থ অর্থ অধিক উপযুক্ত বলে মনে করা যায়। কেবল 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পশ্চিমা অভিধানভিত্তিক অনুবাদ থেকে উৎপন্ন; তাই সাবধানতা অনিবার্য।

অভিধানভিত্তিক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

বহুজাতিক অভিধান ও উৎসে সেক্যুলারিজমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে—যা সমগ্রভাবে পশ্চিমা ইতিহাস/সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধিত। উদাহরণ হিসেবে:

ব্রিটানিকা: সেক্যুলারিজমকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে, যা মানুষকে আখেরাত-বিমুখ করে কেবল দুনিয়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে (রেনেসাঁ, আধুনিক ভাষাগত প্রসার ইত্যাদি)।
(https://www.britannica.com/topic/secularism)

ওয়েবস্টার: সেক্যুলারিজমকে প্রথমত দুনিয়াবি প্রবণতা ও ধর্ম-বিরোধী নীতিমালা, দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মের আলাদা অবস্থান দাবি—এসবভাবে সংজ্ঞায়িত করে। (https://www.merriam-webster.com/dictionary/secularism)

অক্সফোর্ড: 'সেক্যুলার' শব্দকে বস্তুনিষ্ঠভাবে দুনিয়াবাদী বা ধর্মহীন হিসেবে বিবেচনা করে এবং এটিকেই নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে ধর্মকে উপেক্ষা করার মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে বলে ব্যাখ্যা করে।
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/secularism)

প্রাচ্যবিদ আরবেরি সতর্ক করে দেখান যে, পশ্চিমা প্রসঙ্গে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার কৃষ্টিটি বিশেষ প্রদর্শিত হয়েছে—যা প্রজাতন্ত্রী তুরস্ক প্রভৃতি উদাহরণে অভিব্যক্ত।
এই অভিধানভিত্তিক বর্ণনা থেকে পরিস্কার যে সেক্যুলারিজমের বহুমাত্রিকতা রয়েছে—এবং এর অর্থ কেবল 'রাষ্ট্রধর্মপঙ্খতা' নয়, বরঞ্চ ধর্মীয় প্রভাবকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক ব্যবস্থাপনা থেকে সরিয়ে ফেলার একটি বিস্তৃত দিকও অন্তর্ভুক্ত করে।

সংজ্ঞাগত দিক বনাম ফলগত দিক (দুইটি পৃথক মাত্রা)

পাঠ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে সেক্যুলারিজমকে দুইভাবে বিবেচনা করা জরুরি—সংজ্ঞাগত (তার ঘোষণা/বক্তব্য অনুযায়ী) এবং ফলগত (বাস্তবে যা ঘটে)।

সংজ্ঞাগত দিক

সংজ্ঞাগতভাবে সেক্যুলারিজম দাবি করে: রাষ্ট্র সব ধর্ম ও মতের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে; রাষ্ট্র নিজে কোনও ধর্ম গ্রহণ করবে না; ব্যক্তিরা তাদের মত অনুযায়ী ধর্ম পালনে স্বাধীন হবে; এবং রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ থাকবে না। এই সংজ্ঞার মধ্যে দুইটি উপাদান স্পষ্টভাবে দেখা যায়:

(ক) ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা; এবং

(খ) সব মতের প্রতি সমান ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ।

ফলগত দিক

কার্যত যখন ধর্মকে 'ব্যক্তিগত' পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করা হয়, তখন ব্যক্তির সিদ্ধান্তগুলো—যদি পরিবার, সম্প্রদায় বা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে—তাহলে তা পাবলিক লাইফে পরিণত হয় এবং সেক্যুলার নীতিগুলি ব্যক্তির পরিবার-সম্পর্কীয় বিষয়েও হস্তক্ষেপের সীমা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, সংজ্ঞাগত নিরপেক্ষতার আড়ালে প্রভাবশালীভাবে ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও আল্লাহর ধারাকে সামাজিক ও নৈতিক জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে সেক্যুলারিজমের বাস্তব প্রভাব কেবল রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা নয়; এটি ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা ও পেশাগত নীতিতেও গভীরভাবে প্রবেশ করে।

সেক্যুলারিজম ও ব্যক্তিগত-সামাজিক প্রভাব

উল্লেখিত দৃষ্টান্তগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, সেক্যুলারিজমের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তির পেশাগত সিদ্ধান্ত, নৈতিক অপরাধ-বিবেচনা ও সামাজিক আচরণে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ—কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কোনো আচরণকে হারাম মনে করলেও পেশাগতভাবে তা গ্রহণযোগ্য মনে করলে এটি ধর্মীয় কর্তৃত্বের ওপর চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। অনুরূপভাবে, ধর্মীয় অবস্থান থেকে আলাদা হয়ে 'টলারেন্স' নামে সব ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমতলীকরণ করলে তা সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে—কারণ টলারেন্সের ব্যাখ্যা যদি 'ভিন্নমতকে সমান মর্যাদা দেওয়া' সীমাবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তাতে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের মানদণ্ড লোপ পেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, শাসন ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব সম্পর্কিত অবস্থান

ইসলামবোধ অনুযায়ী বিষয়টি স্পষ্ট ও সমন্বিত: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; ফলে এর বিধান ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য।

নবীদের মূল আহ্বান ছিল উলুহিয়্যাত ও উবুদিয়্যাত—অর্থাৎ তাওহিদ ও আল্লাহর উর্ধ্বে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্বীকার করা। সুরা নাহলের ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছি, এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।"

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে নবী-রাসুলদের দাওয়াতের মূল আহ্বান ছিল তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ। তার মানে এই নয় যে তারা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর অস্বীকৃতিকে মেনে নিতেন। অধিকাংশ মানুষ স্বভাবগতভাবেই স্রষ্টায় বিশ্বাসী, ইবাদতের জায়গায় এসে মানুষের ভ্রষ্টতা খুব বেশি প্রকাশ পায়। ফলে নবী-রাসুলদের দাওয়াতে আল্লাহর উবুদিয়্যাতের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

কোরআন ও তাফসির সূত্রে এবং সালাফ/আলেমদের ঐতিহাসিক বক্তব্য অনুযায়ী: যদি কেউ রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে, তা জাহিলিয়াতী শাসন ব্যবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তনের সমতুল্য; কুরআন এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিন্দা করেছে—

"...اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِیَّۃِ یَبۡغُوۡنَ ... ﴿۵۰﴾"

"তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়?"(সূরা মায়িদা, আয়াত ৫০)

ঘোষিত হচ্ছে শরীয়ত দেয়া হয়েছে শুধু আমাদের পরীক্ষার জন্যে, যেন তিনি আমাদের বাধ্য ও অনুগত লোকদেরকে পুরস্কার এবং অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি দেন। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি ঐ জিনিস দ্বারা আমাদের পরীক্ষা করেন যা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ কিতাব।

অতএব, আমাদের উচিত মঙ্গল ও পুণ্যের দিকে দৌড়িয়ে যাওয়া, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর শরীয়ত মেনে চলতে আগ্রহী হওয়া এবং সর্বশেষ কিতাব এবং সর্বশেষ নবী (সঃ)-এর মনে প্রাণে আনুগত্য করা। আমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল আল্লাহরই কাছে। সেখানে তিনি আমাদেরকে আমাদের মতভেদের মধ্যে প্রকৃত মত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিতদের তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং মিথ্যা ও বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিরুদ্ধবাদী ও প্রবৃত্তিপূজারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। যারা হককে মানা তো দূরের কথা, বরং হকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যহহাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই উত্তম।
কুরআনে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা সুস্পষ্টভাবে কুফুর বা ইসলামী বিধান থেকে পৃথক হওয়ার শামিল বলে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলাদেশী প্রেক্ষাপটের উল্লেখযোগ্য আলেমগণের বক্তব্যও (মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইত্যাদি) এটা প্রতিফলিত হয়েছে যে—, ইসলামে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামে আলাদা কোনো ধারণা নেই; ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যাত হতে হবে।

সেক্যুলারিজম একটি বহুমাত্রিক ধারণা—যা অভিধানভিত্তিকভাবে রাষ্ট্র-ধর্ম বিচ্ছিন্নতা, ধর্মহীনতা বা পার্থিবতাকে নির্দেশ করে; তবে বাস্তব প্রয়োগে এটি ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের ওপর ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রভাব হ্রাস করে এমন ফল সৃষ্টি করে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জীবনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা মূলত অপরিহার্য; অতএব রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা সমালোচনীয় এবং ইসলামী তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত বলে বিবেচিত হয়।

ইসলাম কি?

ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ ধর্ম, যার প্রতি আমরা বিশ্বাস করি, যার দাওয়াত প্রদান করি, এবং যা দুনিয়া ও আখিরাতে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হিসেবে স্বীকৃত। এই দ্বীন সেই আকিদা, ইবাদত, আখলাক, শিষ্টাচার ও মুয়ামালার সমষ্টি—যা আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে নাজিল করেছেন এবং তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। একজন ব্যক্তি যখন এ দ্বীনের প্রকৃত উপলব্ধি অর্জন করে এবং সঠিকভাবে এর বিধান অনুসরণ করে, তখন তার ব্যক্তিজীবন পবিত্র হয়, পরিবারে স্থিতিশীলতা আসে, সমাজ সুদৃঢ় হয়, রাষ্ট্রে পরিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর বিধান পালনের পরিমাণ অনুযায়ী সামগ্রিক জীবন হয়ে ওঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ। বিপরীতভাবে, এর সঠিক উপলব্ধি ও অনুশীলনে ব্যর্থতা জীবনের প্রতিটি স্তরে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

ইসলামের মৌল উৎস হলো আল-কুরআন—যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। ১৪০০ বছরের অধিক সময় ধরে এর শব্দ বা বর্ণে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। আর কুরআনের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা নির্ভর করে নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ সুন্নাহর উপর; অর্থাৎ তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের উপর। আল্লাহ তায়ালা বলেন:
"আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যে-গুলো তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা নাহল: ৪৪)

এখানে স্পষ্ট যে, মানুষের ব্যক্তিগত মতামত, আচরণ বা ব্যাখ্যা ইসলাম নয়; কেননা মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন—অমুক-তমুক ব্যক্তির বক্তব্য বা কাজ নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির মত ও কর্ম গ্রহণযোগ্য অথবা বর্জনযোগ্য হতে পারে। তবে উম্মাহ কোনো আলেম, মুজতাহিদ বা বিষয়সমূহে যখন সর্বসম্মত মত প্রকাশ করে (ইজমা), তখন তা ব্যতিক্রম; কারণ এই উম্মাহ গোমরাহির উপর একমত হবে না—এটি একটি স্বীকৃত নীতিসত্য।

ইসলামের সঠিক বোঝাপড়া ও বাস্তবায়নে চার খলিফার সুন্নাহ বিশেষ স্থান অধিকার করে। কেননা তারা নবীজির যুগের নিকটবর্তী ছিলেন এবং তাদের চারপাশে ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবিগণ, যারা পরস্পরকে উপদেশ দিতে দ্বিধা করতেন না, কোনো অন্যায়ের ক্ষেত্রে নীরব থাকতেন না এবং কোনো মন্দ কাজকে সমর্থনও করতেন না।

এই প্রেক্ষাপটেই সহিহ হাদিসে এসেছে:

فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"অতএব তোমাদের উপর তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদ্বীনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২)

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুসলিম সমাজের বিচ্যুতি বা ভুল তাদের ব্যক্তিগত সত্তার ওপর বর্তায়; ইসলাম এজন্য দায়ী নয়। অতএব বিচ্যুতির উদাহরণ ইসলামবিরোধী দলিল নয়; বরং ইসলামের কাঠামো তাদের বিচ্যুতিকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে। এই সেই ইসলাম, যার দিকে আমরা মানুষকে আহ্বান জানাই—যার আকিদা, ইবাদত, প্রতিপালন, আখলাক, শরিয়াহ এবং বাস্তব অনুশীলন আমরা তুলে ধরি এবং যার দিকে ফিরে যাওয়ার দাওয়াত প্রদান করি।
আমরা আহ্বান করি সেই বিশুদ্ধ, অখণ্ড, মিশ্রণমুক্ত, সরল, পূর্ণাঙ্গ ও আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদভিত্তিক ইসলামের দিকে—যা গোঁড়া ব্যক্তিদের বিকৃতি, বাতিল ধারার মিথ্যা দাবী এবং অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত।

কিন্তু সেক্যুলার মতবাদের অনুসারীরা এই স্বচ্ছ ইসলাম সম্পর্কে সরাসরি আপত্তি তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় নিজেদের কল্পিত একটি ইসলাম রূপান্তরিত করতে চায়, যা সমাজে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চাপিয়ে দিতে আগ্রহী। তাদের কাঙ্ক্ষিত ইসলাম আল্লাহর কিতাব বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের অনুসারী নয়; খুলাফায়ে রাশেদিনের বাস্তবায়ন ধারার অনুসারী নয়; ফকিহ, মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যার ধারাও নয়। বরং তারা এমন একটি ইসলাম কল্পনা করেন, যার উপর ইতিহাসের বিচ্যুতিগুলোর ভার চাপানো যায়, যেন সেটিই ইসলামের মূল পরিচয়।

এ প্রসঙ্গে তাদের প্রতিনিধি দার্শনিক ড. ফুয়াদ জাকারিয়া তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বলেন:
“শরিয়া বাস্তবায়নের আহ্বায়করা সেসময় মারাত্মক ভুল করেন, যখন কুরআন-সুন্নাহ মোয়াফেক ইসলামকে কেন্দ্র তারা ঘাম ঝরান এবং ইতিহাসের বাস্তব ইসলামকে ভুলে থাকতে চান। অর্থাৎ যখন তারা নুসুসের ইসলামকে যথেষ্ট মনে করে বাস্তব ইসলামকে উপেক্ষা করেন।”

তার এই বক্তব্য বিস্ময়কর। তিনি কি বলতে চান যে ইসলামের দাওয়াত মানে হলো—হাজ্জাজ বিন ইউসুফের স্বেচ্ছাচার, আবু নাওয়ামের মদ্যপান, অথবা বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের অবিচারকে ইসলামের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা?

মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে ইসলাম মনোনীত করেছেন, সেটিই মানুষের কাছে অনুসরণীয়। অতএব, যা আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেননি, তা মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। বিকৃত ইসলামকে মানুষকে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করা সম্ভব নয়, এবং শয়তানের গোমরাহির পথকে আল্লাহর হেদায়েতের বিকল্প করা যায় না। সুতরাং দার্শনিকের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে উল্টো দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

সেক্যুলাররা হয়তো যুক্তি দেবে যে আদর্শিক ইসলাম বাস্তবে প্রয়োগ করা কঠিন। কিন্তু প্রথমত—এটাই সেই ইসলাম, যা আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন; এখানে কোনো বিকল্প নেই। দ্বিতীয়ত—পৃথিবীর প্রতিটি মতবাদ বা আন্দোলন তার অনুসারীদেরকে তার আদর্শিক রূপের দিকেই আহ্বান করে; বাস্তব বিচ্যুতির দিক নয়। ব্যক্তির সাধ্য অনুযায়ী সে আদর্শের যতটুকু সম্ভব অর্জনের চেষ্টা করবে, এবং রাষ্ট্রীয় কিংবা নির্দেশনা-দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব হবে সেই আদর্শ অর্জনে সহায়ক হওয়া।

এ প্রক্রিয়ায় কেউ সফল হবে, কেউ ব্যর্থ—এটাই স্বাভাবিক। সঠিক পথে অটল থাকা ব্যক্তিই সাফল্যের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

অন্যদিকে মানুষকে শুরুতেই কোনো আদর্শের দুর্বল, নেতিবাচক বা অন্ধকার দিক প্রদর্শন করা যুক্তিবিরুদ্ধ ও হতাশাজনক। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রসহ সকল মতবাদের প্রবক্তারাই তাদের আদর্শিক রূপের দিকেই দাওয়াত প্রদান করে থাকে।

সেক্যুলারদের আরেকটি আপত্তি হলো—ইসলামের একক কোনো রূপে নাকি মুসলিমদের ঐকমত্য নেই। রক্ষণশীল, মডারেট, নবায়নবাদী, ইখওয়ানুল মুসলিমিন থেকে শুরু করে তাকফির-হিজরত, সহিংস গোষ্ঠী, বাহ্যিকপন্থি গোষ্ঠীসহ নানা ধারার উপস্থিতিতে ইসলামের চিত্র নাকি অস্পষ্ট।

তারা প্রশ্ন তোলে—

ইসলামের কি কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো আছে? নারী, শূরা, স্বাধীনতা, অমুসলিমদের অধিকার—এসব বিষয়ে ইসলামের অবস্থান কী?

এই প্রশ্নের জবাব অবশ্যই প্রযোজ্য। এবং আগেই বলা যায়: মূলত এই পর্যবেক্ষণ আংশিকভাবে সত্য। তবে পাশাপাশি এটিও সত্য যে, আমরা যে ইসলামের দাওয়াত দিই তা হলো সেই মধ্যপন্থি, ভারসাম্যপূর্ণ ও নীতিনিষ্ঠ ধারার ইসলাম—যা আলোকিত চিন্তা, সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি এবং

উম্মাহর স্থায়ী মূলধারার প্রতিনিধিত্ব করে। এটি দীর্ঘস্থায়ী ও স্থিতিশীল। আর চরমপন্থা—চাই তা অতিরিক্ত কঠোর হোক বা অতিরিক্ত শিথিল—দীর্ঘস্থায়ী নয়।

এই মধ্যপন্থি ধারার স্বরূপকে কয়েকটি মৌলিক নীতিমালায় স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, যা এর দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্যকে সুসংহত করে।

পরিশেষে বলা যায়—এটাই সেই ইসলাম, যার প্রধান দিকনির্দেশনা আমরা বুঝি এবং যার আলোকে আমরা দাওয়াত প্রদান করি। বাস্তবিক অর্থে, এটি সেই ইসলাম—যার দাওয়াত দেয় ইসলামের মধ্যমপন্থি ধারার প্রবক্তারা।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যা কেবল আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত নিয়মাবলী প্রদান করে। ইসলামের মূল ভিত্তি হল তাওহীদ— এক আল্লাহর একত্বের ধারণা, যা মানুষের জীবনকে নৈতিক ও সামাজিক নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত করার একটি সূচনা। ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা কেবল ধর্মীয় আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবজীবনের জন্য একটি সমন্বিত দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। ইসলামের এই বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি মানব সমাজের স্থায়ী ন্যায়, শান্তি ও প্রগতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ইমাম হাসান আল বান্না এই পূর্ণাঙ্গতার ধারণাটিকে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে তিনি ইসলামের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক প্রয়োগকে একত্রিত করেছেন।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা বোঝার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা বিশ্লেষণ করা। ইসলামী রাষ্ট্রনীতি কেবল আইন প্রয়োগ নয়, বরং এটি একটি নৈতিক কাঠামো যা জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করে। ইসলাম মানবাধিকার, নারী ও পুরুষের ন্যায্য অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষার সমান সুযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলামের এই দিকগুলো শুধু তাত্ত্বিক নয়, বরং ইতিহাস ও বাস্তব জীবনের উদাহরণ দ্বারা প্রমাণিত।

মুসলিম জনসাধারণ এবং বিশেষ করে ইসলামি দাওয়াহর কর্মীদের জন্য ইসলামের মূলতত্ত্বের যথার্থ অনুধাবন জরুরি। বর্তমান সময়ে তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর খেয়াল রাখতে হবে, ইসলাম অনুধাবনের এই অভিযাত্রায় ইসলাম যেন বিকৃত বা পরিবর্তিত কোনো রূপে মানুষের সামনে উপস্থাপিত না হয়। মানুষ যেন ইসলামকে তার প্রকৃত সত্তার বিপরীত বা মিশ্রিত কিছু মনে না করে। আর ইসলামের কোনো অংশকে যেন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া না হয়। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ ইসলাম হিসেবে যা পালন করছে, তা আসলে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নয়; বরং ইসলামের একটি অংশবিশেষ।

এখানে ইমাম হাসান আল বান্নার বিশ মূলনীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইমাম বান্না তাঁর দাওয়াতি আন্দোলনের জনশক্তিদের চিন্তাগত ঐক্যের প্রয়োজনে এই নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। এই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইমাম বান্না অবলম্বন করেছেন মধ্যপন্থস্থা ও ভারসাম্যের নীতি। কট্টরপন্থিদের কঠোরতা কিংবা উদারপন্থিদের অতি উদার মনোভাব বা শিথিলতা তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

এ বিশ মূলনীতি প্রণয়নে ইমাম হাসান আল বান্না হিকমত ও আমানতদারিতার সাথে শব্দচয়ন করেছেন, যেন বিবদমান ইসলামি অঙ্গনগুলোর মাঝে এগুলো ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে। যদিও

মৌলিক ও শাখাপর্যায়ের কিছু বিষয়ের বোঝাপড়ায় ইসলামি দলগুলোর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আর এ মতপার্থক্য প্রায়শ দলগুলোকে ঝগড়া, হানাহানি ও কটাক্ষের দিকে নিয়ে যায়। তারপরও ইসলামি দলগুলোর চিন্তাকে মৌলিক বিষয়াদিতে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করা সম্ভব।

মতবিরোধ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন- মীমাংসা প্রদানকারী কোনো মানদণ্ডের অনুপস্থিতি, ইলম ও হুকুমের উৎস নির্ধারণ না করা, কোনো কিছুকে তার যথাযথ অবস্থান অনুযায়ী মূল্যায়ন না করা, অপরপক্ষের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা, দুই বা ততোধিক মতসম্পন্ন সমস্যায় গভীর ও সূক্ষ্ম মনোনিবেশ না করা- ইত্যাদি কারণে মতবিরোধ হতে পারে। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করা যায় যে, মিশরের দ্বীনি প্ল্যাটফর্মগুলো একে অপরকে অপবাদ দিচ্ছিল। তারা কেবল নিজেদেরকেই হক এবং অন্য সবাইকে বাতিল বলে মনে করছিল। এমনকি কেউ কেউ সীমা ছাড়িয়ে অপরপক্ষকে 'কাফির' পর্যন্ত ঘোষণা দিচ্ছিল। এই অংশে সংক্ষিপ্তভাবে দ্বীনি সংগঠনগুলোর অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে-

ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মিশরের দ্বীনি সংগঠনগুলোর অবস্থা

ইমাম হাসান আল বান্না যখন তাঁর দাওয়াতি মিশন শুরু করছিলেন, তৎকালীন মিশরের ইসলামি সংগঠনগুলোর সবারই একটা কমন সংকট ছিল। ইসলামি সংগঠনগুলো ঐশী বিধানের কোনো একটি দিকের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিত এবং অন্য দিকগুলোকে অবহেলা করত; বরং আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে-গোনায়ও ধরত না। সম্ভবত, দলগুলো ইসলামে যে দিক নিয়ে কাজ করছে, যে দিকের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছে কোনো একসময় তা অবহেলিত ছিল। তাই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই দলগুলোর পূর্ণ মনোনিবেশ সেই বিষয়ে বা কাজে নিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দলগুলো তাতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তাদের কার্যক্রম প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ: এই দলটি আকিদায় বেশি গুরুত্ব দিত। সেইসাথে তারা আকিদায় প্রবিষ্ট সকল বড়ো ও ছোটো শিরকের পরিশুদ্ধির জন্য কাজ করত। ওলিদের পবিত্র জ্ঞানকারী এবং মাজার তাওয়াফকারীদের বিরুদ্ধে আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ সংগ্রাম করত। জামইয়্যাহ শারইয়্যাহসহ যারা আল্লাহর গুণাবলিসংক্রান্ত আয়াত-হাদিসের ব্যাখ্যা করত, তাদের বিরুদ্ধে আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ ছিল আক্রমণাত্মক। আনসারুস সুন্নাহর সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সুফিবাদীরা। নতুন ধারার সুফি, প্রাচীনপন্থি সুফি, মধ্যপন্থি সুফি, নববি সুফি, আমলি সুফি- সবাই ছিল আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহর ঘোরতর শত্রু।

আল জাময়িয়্যাতুশ শারইয়্যাহ: এই দলটি ইবাদত-বন্দেগির ওপর বেশি গুরুত্ব দিত; বিশেষ করে সালাতের জ্ঞানগত ও আমলগত দিকসমূহের ওপর।
সুন্নাহমাফিক ইবাদত প্রতিপালন এবং ইবাদতের অঙ্গনে বিদআত প্রতিরোধে কাজ করত তারা। জামইয়্যাহ শারইয়্যাহ দলটি জায়গায় জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করত। কিন্তু তারা আযহারের অধিকাংশ আলিমের মতো আল্লাহর গুণবাচক আয়াত-হাদিসকে ব্যাখ্যা করত। এজন্য জামইয়্যাহ শারইয়্যাহ এবং আনসারুস সুন্নাহর মাঝে উত্তাপ বেড়েই চলছিল।

জামইয়্যাতুশ শুব্বানিল মুসলিমিন: এই দলটির কর্মকাণ্ডে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বেশি গুরুত্ব পেত। তারা সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, অ্যাকাডেমিক কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করত। খেলাধুলায়ও তাদের অংশগ্রহণ ছিল সমানতালে। কারণ, খেলাধুলায় যুব সমাজের স্বভাবজাত ঝোঁক রয়েছে।

শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ: এই দলটি পোশাক-পরিচ্ছদ, নারী-পুরুষের মেলামেশা ইস্যু, বিশেষ করে মুসলিম নারীসংক্রান্ত বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করত। তারা এটাকে নিজেদের প্রধান কর্ম বানিয়ে ফেলেছিল। শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ দলটি গণহারে হালাল ও বৈধ ঘোষণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তারা পরিবার ও নারীসংক্রান্ত ব্যাপারে সবচেয়ে কঠিন মতটি গ্রহণ করত। নারী-পুরুষের সাক্ষাতের ব্যাপারে শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ দলটি ছিল খুবই কঠোর। তারা মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রাখার পক্ষে সকল মতের একাট্টা বিরোধিতা করত। শাবাবু সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ দলটির সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এই একটি ক্ষেত্রকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল।

সুফি তরিকাসমূহ: সুফিপন্থিদের মাঝে কিছু লোক ছিল একনিষ্ঠ ও সত্যপন্থি। আবার কিছু লোক ছিল, মূর্খ ও অন্ধ অনুসরণকারী। আর বাকিরা ছিল দাজ্জাল ও গাদ্দার চরিত্রের। তাদের উৎপাতে সঠিক ইসলামি চিন্তা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। সুফিবাদীদের পূর্ণ মনোনিবেশ ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক ইবাদত চর্চায়। তাদের কিছু সমাজমুখী কার্যক্রম থাকলেও তা ছিল তরিকার গণ্ডির ভেতরে থেকে। সুফিবাদীদের অধিকাংশই ইবাদতে খামখেয়ালি, আকিদায় প্রান্তিক অবস্থান এবং চারিত্রিক ত্রুটির দোষে দুষ্ট ছিল।
এই ছিল তৎকালীন মিশরের দ্বীনি জামায়াতগুলোর অবস্থা। ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রাক্কালে ইসলামি দলগুলো এ ধরনের এককেন্দ্রিক কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল।
অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; মুসলিমরা সবাই মিলে এক উম্মাহ। তখন ইসলামি শরিয়াহর ওপর মানবরচিত আইন প্রাধান্য বিস্তার করছিল, পশ্চিমা চিন্তা ইসলামি দর্শনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, পশ্চিমা রীতিনীতি ইসলামি জীবনাচরণকে গৌণ করে দিচ্ছিল, খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম বিশ্বের ওপর জেঁকে বসেছিল, শরিয়াহকে উপেক্ষা করা

হচ্ছিল, হুদুদকে (শরয়ি দণ্ডবিধি) অকার্যকর করা হচ্ছিল, উম্মাহ হয়ে গিয়েছিল খণ্ড-বিখণ্ড আর খিলাফত চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং দ্বীনকে জীবনঘনিষ্ঠতা ও সামাজিক নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। দুনিয়ায় যখন এসব ঘটনাবলি আবর্তিত হচ্ছিল, তখন এসব বিষয় নিয়ে ইসলামি সংগঠনগুলোর মাঝে তেমন কোনো উদ্বেগ দেখা যায়নি। আর এসব ঘটনাকেন্দ্রিক দলগুলোর উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যক্রম ছিল না বললেই চলে। হ্যাঁ, খুবই সামান্য ও ইস্যুকেন্দ্রিক অল্প কিছু কাজকর্ম বিক্ষিপ্তভাবে হচ্ছিল। এই অল্পস্বল্প কাজের পেছনে সংগঠনগুলোর সামগ্রিক ভূমিকার চেয়ে সেখানে থাকা কতিপয় জিন্দাদিল ব্যক্তিরাই ভূমিকা রাখছিল। অর্থাৎ, সচেতন কিছু মানুষ সব জায়গাতেই ছিল।

ভালো নিয়ত ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা থাকার পরও এই দ্বীনি সংগঠনগুলোর অবস্থা হয়েছিল অন্ধের হাতি দেখার গল্পটার মতো। তারা একসাথেই হাতি স্পর্শ করেছিল। একেকজন একেক অংশ স্পর্শ করার কারণে হাতির ধারণাও একেকজনের কাছে একেক রকম মনে হয়েছে। তাদের যখন হাতির অবয়ব বর্ণনা করতে বলা হলো, তখন একজন বলল, এটা মসৃণ চিকন হাড়। কারণ, সে শুধু দাঁত স্পর্শ করেছে। দ্বিতীয়জন বলল, এটা বিশাল চওড়া শরীর। কেননা, সে শুধু পেট স্পর্শ করেছে। তৃতীয়জন বলল, হাতি হলো খাড়া খাম্বার মতো। যেহেতু সে শুধু পা স্পর্শ করেছিল। চতুর্থজন আরেক রকম বর্ণনা দিলো। কারণ, সে শুধু লেজ স্পর্শ করেছে। পঞ্চমজন শুঁড় স্পর্শ করেছে বলে পূর্ববর্তী চারজনের চেয়ে ভিন্ন বর্ণনা দিলো। তাদের প্রত্যেকে সত্য কথা বলেছে, কিন্তু কেউ-ই হাতির সামগ্রিক অবয়ব বর্ণনা করতে পারেনি। কারণ, তারা যেভাবে জেনেছে, ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করেছে। যদি তারা নিজ চোখে হাতি দেখতে পেত, তবে তাদের মত বদলে যেত এবং তাদের বর্ণনায় হাতির আকৃতিও হতো যথার্থ।
ইসলামি সংগঠনগুলোর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ঠিক এমনই। কেউ মনে করছিল, ইসলাম শুধু আকিদায়। অপরদল ইবাদতকেই ইসলাম মনে করছিল। তৃতীয় পক্ষের মত ছিল- বিনয় ও পবিত্রতা সবকিছুর আগে। চতুর্থদলের কাছে রুহ ও কলবের পবিত্রতাই সব। এগুলোর প্রত্যেকটিই ইসলামের প্রশ্নে সঠিক। কিন্তু এগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নয়; এসবের প্রতিটিই ইসলামের একেকটি অংশ মাত্র।

একটি সংগঠন ইসলামের কোনো একটি বিশেষ দিকে বেশি গুরুত্ব দিতেই পারে। এতে শরিয়ত বা বিবেকের কোনো বাধানিষেধ নেই। সেই সংগঠন ইসলামের একটি বিষয়কে তাদের কর্মের অঙ্গন করে নিতে পারে। নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাও তার পেছনে বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে সেই সংগঠনের সাথে অন্যদের মতপার্থক্য হবে নিয়মতান্ত্রিক; পরস্পর বিপরীতমুখী মৌলিক মতপার্থক্য নয়। সমস্যা হয় তখনই, যখন দলগুলো ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা অস্বীকার করে এবং তারা যে অংশে গুরুত্ব দেয়, শুধু সেটাকেই ইসলাম মনে করে। সেইসাথে অন্যান্য অঙ্গনে

যারা কাজ করে, তাদের বিরোধিতা করে এবং বৃহত্তর পরিসরের কাজগুলোতে সহায়তার পরিবর্তে অসহযোগিতা করে।

রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থা

সেসময় মিশরে বেশ কিছু দল রাজনৈতিক অঙ্গনকে মুখর রাখত। এই দলগুলো ছিল সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত। মিশরে ভূমিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের পূর্বে উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক দলগুলোতে ব্যক্তিগত ও চারিত্রিকভাবে ধার্মিক লোকজনও ছিল, কিন্তু এগুলো কোনো বিশ্বাসভিত্তিক দল ছিল না।

এই রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ নেতা ইউরোপে পড়তে গিয়ে কিংবা, নিজ দেশে বিদেশি শিক্ষাধারায় পড়ে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিল। তারা ছিল ডানলফ এবং তার সতীর্থদের উদ্ভাবিত বিষাক্ত উপনিবেশবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত। ইউরোপীয়রা খ্রিষ্টধর্মকে যেমন মনে করত, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ঠিক তেমন। তাদের ধারণা-মতে- 'ধর্ম হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে আবর্তিত সম্পর্ক আর একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। দ্বীন মানে পুরোহিত-পাদরির ব্যাপার-স্যাপার। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সময়ের পরিবর্তন এবং মানবীয় চিন্তার উন্নতির সাথে সদা পরিবর্তনশীল।'

কথিত এই আধুনিক লোকদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটো বিষয়। তারা ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বলে বেড়ায়- "ধর্ম ও বিজ্ঞান কখনও একসাথে চলতে পারে না। একটি জাগ্রত জাতি, যারা সত্যিকারার্থেই উন্নতি চায়, তারা বিজ্ঞানের পথই অবলম্বন করবে, যুবসমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলবে। " (ড. ইউসুফ আল কারজাভি তার বই বাইয়িনাতিল হাল্লিল ইসলামি (বিজ্ঞানের যুগে দ্বীন)-এর 'আদ দ্বীন ফি আসরিল ইলম' অধ্যায়ে তাদের এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার অসারতা তুলে ধরে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।)

এ সকল কথিত আধুনিকতাবাদীরা ধর্মকে সরাসরি বাদ দেয় না বটে, তবে গুরুত্বহীন ও কর্তৃত্বহীন করে রাখতে চায়। তাদের এই বিজ্ঞানমনস্কতার বক্তব্য আসলে একটি খোলস মাত্র। তারা চায়, এর মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামের কালজয়ী আদর্শকে অপ্রাসঙ্গিক করে রাখতে। তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য মোটেও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার বিস্তৃতি নয়। কারণ, ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পর সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় নয়; বরং ইসলাম তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে সব সময় উৎসাহিতই করেছে।

ইসলামি দাওয়াহর কৃত্রিম বিভাজনের মোকাবিলা

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে পরিবেশ এমন ছিল যে- ইসলামকে ওপরে উল্লেখিত নানাবিধ বিকৃত বৃত্ত ও বৈশিষ্ট্যে কল্পনা করা হতো। তাই এই দাওয়াতি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার ওপর ইসলামের সীমিত ধারণার মোকাবিলায় ইসলামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সংগ্রামী দিকসমূহ তুলে ধরার দায়িত্ব এসে পড়ল। আবশ্যক হয়ে পড়ল- প্রশস্ত ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেওয়া খণ্ডিত ধারণার অপনোদন করা। সেক্যুলার চিন্তার ধারকরা ইসলামের নামে আরেকটি খ্রিষ্টবাদের জন্ম দিতে চাচ্ছিল; অথচ ইসলাম কখনোই খ্রিষ্টবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণে ইমাম বান্না তাঁর গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি ও বয়ানে বহুবার, বহু জায়গায় এ বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে- ইসলামের ব্যাপকতার মানে হলো ইসলামের সেই রূপ, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. নির্মাণ করেছেন। ব্যাপকতর ইসলামের এই ধারণার কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিন অন্য সকল সংগঠনের মাঝে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পঞ্চম সাধারণ সম্মেলনের বক্তৃতায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও ব্যাপকতার এই তত্ত্বের নাম দেন 'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম'।

ইসলামের এই ব্যাপকতার আঙ্গিক ও অবয়ব স্পষ্ট করার জন্য ইমাম হাসান আল বান্না বিশটি মূলনীতি সংবলিত রিসালাতুত তায়ালিম প্রণয়ন করেছেন। সেই বিশ মূলনীতির প্রথম নীতিটি দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে বলছে-

"ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা- যা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, যেমনিভাবে ইসলাম সত্য আকিদা ও বিশুদ্ধ আমল, ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম হচ্ছে- রাষ্ট্র ও দেশ তথা শাসনব্যবস্থা ও জাতি, আখলাক ও শক্তি (Power) তথা রহমত ও আদালত, সংস্কৃতি ও আইন তথা জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিচারব্যবস্থা, পুঁজি ও সম্পদ তথা উপার্জন ও প্রাচুর্য, জিহাদ ও দাওয়াত তথা সেনাবাহিনী ও আদর্শ। ইসলামে এই উভয় দিকই সমান গুরুত্বের দাবিদার।"

কালের আবর্তনে ইসলামের ধারণা থেকে কিছু বিষয় ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাবশত অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। যেমন- রাষ্ট্র, জাতি, জিহাদ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদি। তাই ইখওয়ানুল মুসলিমিন দাওয়াতের ক্ষেত্রে এগুলোর ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিত। এগুলোর অস্পষ্টতার পেছনে ঔপনিবেশিকদের হাত ছিল। ঔপনিবেশিকরা এর পেছনে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার খরচ করে তাদের অনুগত ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে ইসলামকে রাষ্ট্র ও বিচারালয় থেকে পৃথক করার জন্য কাজ করেছে। যেমন- আলি আবদুর রাজ্জাক তার 'ইসলাম ও শাসনব্যবস্থা' বইতে ইসলামকে শাসনকার্য থেকে পৃথক

করার প্রস্তাব করেছে। কামাল আতাতুর্ক তুরস্ক রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা করে ছেড়েছে। ভারতবর্ষে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি এবং ইংরেজসৃষ্ট তার অনুসারীরা ইসলাম থেকে জিহাদকে পৃথক করার কাজ করেছে।

কাদিয়ানিদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োজিত ছিল দুটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করার পেছনে-প্রথমত, সরকার কাফির হলেও তার আনুগত্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বিলোপ সাধন। কাদিয়ানিদের এই দুটি আহ্বান থেকে শুধু একটি পক্ষই লাভবান হতো; আর তারা হলো- মুসলিমদের ভূমি জবরদখলকারী এবং কল্যাণের পথরুদ্ধকারী ঔপনিবেশিকরা।

ইসলামের ব্যাপকতায় জোর দেওয়ার কারণ

মূলত তিনটি কারণে ইমাম হাসান আল বান্না এবং তাঁর সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইসলামের ব্যাপকতায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এই তিনটি কারণে সামগ্রিক ও ব্যাপকতর ইসলামের ধারণা গ্রহণ করা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে।

এক. ইসলামি জ্ঞানের ব্যাপকতা

ইসলাম মানবজীবনের কেবল কোনো একটি দিক নিয়ে কথা বলেনি; বরং জাগতিক, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক সকল দিক নিয়েই কথা বলেছে। এ সবকিছুই ইসলামের নির্দেশনার গণ্ডির ভেতরে অবস্থান করছে। কুরআনুল কারিমের সবচেয়ে বড়ো আয়াতটি জাগতিক বিষয়ে নাযিল হয়েছে। আর সেই আয়াত হলো ঋণের বিধান সংক্রান্ত আয়াত-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَ لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ﴿۲۸۲﴾

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিখে রাখো। তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সংগতভাবে তা লিখে দেবে। যারা লিখতে পারে তারা যেন লিখতে অস্বীকার না করে; আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেওয়া। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ-কম না করে।" (সূরা বাকারা: ২৮২)
যে কুরআনে কারিম বলছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...﴿۱۸۳﴾ۙ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে...।" (সূরা বাকারা: ১৮৩)

সে কুরআনই আবার বলছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِصَاصُ فِى الۡقَتۡلٰى ؕ ...﴿۱۷۸﴾
"হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস (দণ্ডবিধান) ফরজ করে দেওয়া হলো...।" (সূরা বাকারা: ১৭৮)

একই কুরআন বলছে-

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ اِنۡ تَرَكَ خَيۡرَا ۖۚ الۡوَصِيَّةُ لِلۡوَالِدَيۡنِ وَ الۡاَقۡرَبِيۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ...﴿۱۸۰﴾
"তোমাদের ওপর এ বিধান দেওয়া হলো যে, যখন তোমাদের মধ্যে ধনসম্পদ আছে এমন কারও কাছে মৃত্যু এসে পড়ে, তাহলে সে যেন মাতাপিতা ও আত্মীয়দের জন্য ন্যায়সংগতভাবে ওসিয়ত করে...। (সূরা বাকারা: ১৮০)

একই সূরাতে কুরআনে হাকিম বলছে-

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ وَ هُوَ كُرۡهٌ لَّكُمۡ ۚ وَ عَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡئًا وَّ هُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ۚ ...﴿۲۱۶﴾
"যুদ্ধকে তোমাদের ওপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। হতে পারে এটা তোমাদের কাছে অপ্রিয়; অথচ তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।" (সূরা বাকারা: ২১৬)

কুরআন উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ফরজ করার ক্ষেত্রে একই শব্দ كتب عَلَيْكُم ব্যবহার করেছে। আল্লাহপাক এগুলোর সবই মুসলিমদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। সিয়াম ইবাদতের অধ্যায়ে, কিসাস ফৌজদারি আইনের অধ্যায়ে, ওসিয়ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন অধ্যায়ে এবং কিতাল (যুদ্ধ) আন্তর্জাতিক নীতি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সবই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। মূলত এগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুমিনরা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করে। সুতরাং, কোনো মুমিন সিয়াম পালন করবে আর কিসাস, ওসিয়ত ও কিতাল বর্জন করবে- এটা হতে পারে না।
ইসলামি শরিয়ত তার অনুসারীদের সকল কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়। প্রত্যেকটি কাজই পাঁচটি শরয়ি হুকুমের কোনো একটির আওতার মধ্যে পড়বে। এতে সকল ফকিহ ও উসুলবিদ একমত। ইসলামের এই ব্যাপকতার বিষয়ে কুরআন-হাদিস থেকে প্রচুর দলিল উপস্থাপন করা যায়। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা.-কে উদ্দেশ করে বলেন-

....وَ نَزَّلۡنَا عَلَیۡكَ الۡكِتٰبَ تِبۡیَانًا لِّكُلِّ شَیۡءٍ وَّ هُدًی وَّ رَحۡمَةً وَّ بُشۡرٰی لِلۡمُسۡلِمِیۡنَ ﴿۸۹﴾
"আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।" (সূরা নাহল: ৮৯)

এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, রাসূল সা. এমন সবকিছুই বলে গিয়েছেন, যা আমাদের আল্লাহর নৈকট্যের দিকে নিয়ে যাবে। আর যা দূরে ঠেলে দেবে-তাও বলে গেছেন। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা. আমাদের জন্য রেখে গেছেন সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড-

"তার রাতও দিনের মতো। যে তা থেকে বিচ্যুত হবে, সে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। " (ইবনে মাজাহ: ৪৩। হাদিসটি ইমাম আহমাদ তাঁর গ্রন্থ মুসনাদে সংকলন করেছেন। ইমাম হাকিম সংকলন করেছেন ইরবাদ ইবনে সারিয়ার সূত্রে; মুসতাদরাক: ৯৬, ৯৭/১)

সুতরাং, ইসলাম পুরো জীবনের জন্য বার্তা বহন করে, সকল মানুষের জন্য বার্তা বহন করে। একইভাবে, ইসলামের বার্তা বিশ্বের সকল ভূখণ্ড, জনপদ এবং সকল যুগের জন্য।

দুই. খণ্ডিত দ্বীন-চর্চা ইসলাম-সমর্থিত নয়

ইসলাম তার বিধিবিধানের কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের কোনো সুযোগ রাখেনি। বনি ইসরাইল এ ধরনের দ্বিমুখী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছে কুরআন-

....اَفَتُؤۡمِنُوۡنَ بِبَعۡضِ الۡكِتٰبِ وَ تَكۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنۡ یَّفۡعَلُ ذٰلِكَ مِنۡكُمۡ اِلَّا خِزۡیٌ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یُرَدُّوۡنَ اِلٰۤی اَشَدِّ الۡعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۸۵﴾
"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া কিছুই নেই এবং কিয়ামত দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তোমরা যা করছ- আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন নন।" (সূরা বাকারা: ৮৫; ইমাম ইবনে কাসির এ আয়াতের তাফসিরে বলেন- "আল্লাহ তায়ালা তাঁর যেসকল বান্দা তাঁর ওপর ইমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তাদের আদেশ দিয়ে বলছেন, তারা যেন ইসলামের সকল বৈশিষ্ট্য এবং বিধানকে গ্রহণ করে, তাদের সাধ্যানুযায়ী সকল আদেশ পালন করে এবং সকল নিষেধ মেনে চলে।" তাফসিরে ইবনে কাসির, ২৪৭/১, ইহইয়াউত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত।)

কতক ইহুদি তাদের ধর্মের কিছু বিধান এবং শনিবারের পবিত্রতা বহাল রেখে ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে আল্লাহর রাসূল তাদের সে প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে- ইসলামে প্রবেশ করতে চাইলে সম্পূর্ণভাবেই প্রবেশ করতে হবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা: ২০৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূল সা.-কে সতর্ক করেছেন, যেন অমুসলমিরা তাকে ইসলামের কোনো বিধান থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। এই সতর্কতা শুধু রাসূলুল্লাহর জন্যই নয়; বরং উম্মাহর যারাই ইসলামের জন্য কাজ করবে, তাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য।
বস্তুত ইসলামের বিধিবিধানসমূহ যেমন- শরিয়ত, আকিদা, আখলাক, ইবাদত, মুআমালাত- যে অঙ্গনেরই হোক না কেন, তা পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করা ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না। কারণ, ইসলামের বিধানগুলো একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল; একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের বিধিবিধানের উদাহরণ ডাক্তারি প্রেসক্রিপশনের মতো। একটি প্রেসক্রিপশন কিছু খাবার গ্রহণ, কিছু ওষুধ সেবন, কিছু কাজ থেকে বিরত থাকা এবং কিছু নিয়মিত অনুশীলনের সমন্বয়ে তৈরি হয়ে থাকে। প্রেসক্রিপশনের কার্যকারিতার জন্য এর সবগুলোই অনুসরণ করতে হয়। প্রেসক্রিপশনের এই সামগ্রিক অনুসরণ মানবশরীরকে একটি ফলপ্রসূ অবস্থার দিকে পরিচালিত করে। প্রেসক্রিপশনের প্রত্যেকটি দিক তখন পূর্ণ সক্রিয়তার সাথে কাজ করে। কিন্তু এর কোনো একটি দিকের অনুসরণ যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে গোটা প্রেসক্রিপশনের কার্যকারিতার ওপর প্রভাব পড়বে।

তিন: জীবন অভিভাজ্য

মানবজীবন অভিভাজ্য; একে একাধিক ভাগে ভাগ করার কোনো সুযোগ নেই। যদি মানবজীবনের একটি অংশ মসজিদ ও মসজিদমুখী দর্শনের কাছে সপে দেওয়া হয়, আর অপর অংশটি চলে মানবরচিত দর্শন ও বিধি অনুযায়ী, তাহলে সেই জীবনের পরিশুদ্ধি কখনোই সম্ভব হবে না। ইসলামের জন্য বরাদ্দ থাকবে কেবল মসজিদ। অন্যদিকে স্কুল, কলেজ, আইন-আদালত, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, নাটক, সিনেমা, বাজার, মহাসড়ক- এককথায় অন্য সব কিছু চলবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে। তাহলে কীভাবে সাফল্য সম্ভব!
মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবন দুটি ভিন্ন সুতোয় গাঁথা থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক দিক চলবে দ্বীনের অনুকরণে, আর বৈষয়িক ও চিন্তাগত দিক চলবে ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকরণে- এটি মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। মানবজীবনে দ্বিমুখিতার কোনো সুযোগ নেই। মানুষ কিংবা তার জীবন কোনোটাকেই বিভক্ত করার সুযোগ নেই।

একজন মানুষ তার রুহ ও দেহের সমন্বয়ে গঠিত। এ দুটোর মাঝে কীভাবে বিভাজন করা সম্ভব? এমন বিভাজন বিজ্ঞানসম্মতও নয়। জীবনের ব্যাপারেও একই কথা। মানুষকে যেমন ভাগ করা যায় না, তেমনি মানুষের জীবনকেও ভাগ করা যায় না।

ঐতিহাসিক ও সামসময়িক প্রত্যেকটি দর্শন ও বিপ্লবী আদর্শই নিজ নিজ অঙ্গনে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। তারা জীবনের বিভক্তিকে বর্জন করেছে। জীবনের কোনো একটি অংশের ওপর অন্য কিছুর ছড়ি ঘোরানো তারা বরদাশত করে না। তারা নিজ দর্শনের আলোকে পুরো জীবনকেই পরিচালনা করতে চায়। অস্তিত্ব, জ্ঞান ও মূল্যবোধ সবই পরিচালিত হবে আদর্শের আলোকে। আরবের একজন প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক লেখক (ড. মুনিফ আর রযযার। তিনি একসময় 'হিযবুল বা-স আল ইশতিরাকি আল আরাবি'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন) এ প্রসঙ্গে বলেন-
"সমাজতন্ত্রকে শুধু একটি অর্থনৈতিক দর্শন ভাবা যথার্থ নয়। এ কথা সত্য যে- সমাজতন্ত্র বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দেয়, কিন্তু এটি সমাজতন্ত্রের একটি অংশ মাত্র। শুধু এই একটি দিক থেকে সমাজতন্ত্রকে বোঝার চেষ্টা করলে ভুল হবে; সমাজতন্ত্রের গভীরে আর প্রবেশ করা হবে না। সেইসাথে সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না এবং এর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যেও পৌঁছানো যাবে না।"

লেখক দাবি করেন-
"সমাজতন্ত্র একটি জীবনঘনিষ্ঠ মতবাদ। সমাজতন্ত্র শুধু অর্থনৈতিক মতবাদ নয়; এটি অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, মানোন্নয়ন, সমাজ, স্বাস্থ্য, চরিত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস- সবকিছুতেই অংশগ্রহণ করে। জীবনের প্রত্যেকটি ছোটো-বড়ো বিষয়ে সমাজতন্ত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আপনি সমাজতান্ত্রিক- এর অর্থ, উল্লিখিত সব বিষয়ে আপনার সমাজতান্ত্রিক জ্ঞান ও বিপ্লবী স্পিরিট রয়েছে।"

লেখক জোর দিয়ে বলেন-
"এটি শুধু সমাজতন্ত্রের দর্শনই নয়; বরং অন্য সব কম্যুনিস্ট ধারার মূলমন্ত্রও এটি।"
লেখক সমাজতান্ত্রিক মতগুলোর ব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতা বর্ণনার পর বলেছেন-
"সকল ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সকল সমস্যার সমাধান এখানেই।"

এই পূর্ণাঙ্গতা তত্ত্বের পেছনের কারণ হলো- জীবন একটি অবিচ্ছেদ্য ও অভিভাজ্য বিষয়। জীবন একটি সামগ্রিক প্রবাহ। জীবন মনুষ্যবুদ্ধি-প্রসূত কোনো বিভাজন মানে না। জীবনের মর্ম বোঝার জন্য এ বিভাজন আমরাই সৃষ্টি করি। অতঃপর একপর্যায়ে ভুলে যাই যে, এ বিভাজন আমাদেরই সৃষ্টি। সম্ভবত, এ বিভাজন মানব-ইতিহাসের শুরু থেকেই চলে আসছে।

জীবন মানে কেবল অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি নয়; বরং জীবন এ সবের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামগ্রিক ধারণার নাম। কখনও কখনও আমাদের দুর্বল চিন্তা জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ভুল করে। যদি জীবন নিজেই স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে বিভিন্ন রং ও সম্পর্কের দিকে ভাগ করতে চায় যে তার একটা অংশ রাজনীতির, একটা অংশ অর্থনীতির, একটা অংশ সামাজিকতা, আরেকটা অংশ চরিত্র বা দ্বীনের, আরেকটা অংশ সাহিত্য বা বিজ্ঞানের-তাহলে সে তা পারবে না। নদীর প্রবাহের মতো জীবনও সর্বদা বহমান। একইভাবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, সরকার, রাজনৈতিক দল- সবই সময়ের প্রবাহে গতিশীল; তাদের গণ্ডি ছোটো বা বড়ো যা-ই হোক না কেন!

কোনো সমাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। আবার অর্থনীতি সেখানকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখে। একইভাবে আবাসন, চরিত্র, শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্য ইত্যাদি একটি অপরটির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে প্রভাব রাখে। সেই লেখক সমাজতন্ত্রের কিছু মৌলিক গুণের বর্ণনার মাধ্যমে বইটি শেষ করেছেন।

তিনি বলেছেন-
"এই অর্থে সমাজতন্ত্রকে শুধু অর্থনৈতিক মতবাদের অর্থে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না; বরং এটি জীবন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ।"

এই হলো আগাগোড়া বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী একটি মতবাদের অবস্থা। তাহলে ইসলামকে কেন শুধু মসজিদ এবং শরিয়াহ আদালতে সীমাবদ্ধ করা হবে; অথচ প্রকৃতিগতভাবেই ইসলাম বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও সভ্যতার সমষ্টি। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে যদি সম্ভব হতো, তবে তারা মসজিদ ও শরিয়াহ আদালতকেও ইসলামের স্বাতন্ত্র্যের ওপর ছেড়ে দিত না। মুসলিম বিশ্বের অনেকগুলো দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলো শরিয়াহর কিছু অংশ বলবৎ রেখেছে। আর তা হচ্ছে পারিবারিক আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলি বা যাকে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সেসব দেশের মসজিদের এই স্বাধীনতা নেই যে, ইসলামের বার্তা নিজের মতো করে বলবে; বরং মসজিদে তা-ই বলা হয়ে থাকে, যা প্রশাসন চায়।

বাইবেল বলে-
"যা কায়সারের (সম্রাটের), তা কায়সারের জন্য ছেড়ে দাও। আর যা আল্লাহর, তা আল্লাহর জন্য ছেড়ে দাও।"

যখন খ্রিষ্টান যাজকরা শক্তি ও সুযোগ পেয়েছে, তখন কায়সারের জন্য কিছুই ফেলে রাখেনি। বরং যাজকরাই তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের মোড়ল হয়ে বসেছে। তখন যাজকরা মানবসমাজ ও

মানবজীবনকে সাজিয়েছে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে, আচরণ করেছে নতুন-পুরাতন অন্য সকল ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ধারকদের মতোই। এটাই যখন খ্রিষ্টবাদের অবস্থান, তখন বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে বিভক্তির বিরোধী আদর্শ ইসলাম কীভাবে জীবনের বিভাজনকে সমর্থন করবে? ইসলাম তো জীবনকে কায়সার ও আল্লাহর মাঝে ভাগ করে দেওয়া সমর্থন করে না; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে কায়সারসহ কায়সারের সবকিছুরই মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

কুরআনে হাকিম বলছে-

اَفَغَيۡرَ اللّٰهِ اَبۡتَغِیۡ حَكَمًا وَّ هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ اِلَیۡكُمُ الۡكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ ...﴿۱۱۴﴾
"তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে বিধানদাতা মানব; অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন!" (সূরা আনআম: ১১৪)

اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِیَّةِ یَبۡغُوۡنَ ؕ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ ﴿۵۰﴾
"তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধিবিধান আশা করে? দৃঢ়বিশ্বাসী লোকদের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে আছে!" (সূরা মায়িদা: ৫০)

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মৌলিক দিকসমূহ
ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বিশ মূলনীতির প্রথম নীতিতে ইসলামের বেশকিছু মৌলিক দিক তুলে ধরেছেন। এগুলো হলো-

রাজনৈতিক দিক: এ দিকটি বোঝাতে ইমাম বান্না বলেছেন, 'ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র ও দেশ তথা শাসনব্যবস্থা ও জাতি।'
চারিত্রিক দিক: এই দিককে ইমাম বান্না সংযুক্ত করেছেন 'আখলাক ও শক্তি তথা রহমত ও আদালত' শব্দাবলি দিয়ে।
সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত দিক এবং আইনি ও বিচারিক দিক: এগুলোকে ইমাম হাসান আল বান্না ব্যাখ্যা করেছেন 'সংস্কৃতি ও আইন তথা জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিচারব্যবস্থা' শব্দগুচ্ছ দ্বারা।
অর্থনৈতিক দিক: এটার বর্ণনায় ইমাম বান্না 'পুঁজি ও সম্পদ তথা উপার্জন ও প্রাচুর্য' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।
জিহাদ ও দাওয়াত: এ দুটোকে ইমাম বান্না 'জিহাদ ও দাওয়াত তথা সেনাবাহিনী ও আদর্শ' শব্দাবলির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।
বিশ্বাস ও কর্ম: এ দুটি বিষয় সকল ধর্মের মৌলিক দিক। এ দুটোকে ইমাম বান্না 'বিশুদ্ধ আকিদা ও একনিষ্ঠ ইবাদত' শব্দদ্বয় দ্বারা বুঝিয়েছেন।

ইমাম হাসান আল বান্নার ধ্যান-জ্ঞানে এসব বিষয় ছিল সর্বদা জাগরুক। ইসলামি জীবনাদর্শে এগুলো সুনিশ্চিত ও স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় বলে গণ্য। কুরআন ও সুন্নাহ এবং সালফে সালিহিনের পথনির্দেশনা ও ইমামদের কথায় এসবের বিস্তারিত দলিল পাওয়া যায়।

ইমাম হাসান আল বান্না যখনই সুযোগ পেতেন, তখনই এর প্রতিটি বিষয়ের ওপর তাকিদ দিয়ে কথা বলতেন। অনেকে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে একেবারেই গাফিল- ইমাম বান্না তাদের জানিয়ে দিতে চাইতেন। অনেকে এসব বিষয়াদি সম্পর্কে জানে বটে, কিন্তু অমনোযোগী তিনি তাদের সতর্ক করে দিতে চাইতেন। আবার কেউ দুনিয়ার ব্যস্ততায় এ ব্যাপারগুলো ভুলে বসে আছে, তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইতেন। যাতে এই তৎপরতার মাধ্যমে সংশয়গ্রস্তদের কর্মে বলিষ্ঠতা আসে, আর ঈমানদারদের ঈমান আরও সুদৃঢ় হয়। ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি, সাধারণ সম্মেলনের ভাষণ, বিশেষ সাক্ষাৎকার ও বৈঠকসমূহ, পাঠদান ও ক্লাস, তাঁর গবেষণাপত্র ও প্রবন্ধ প্রত্যেকটি জায়গায় এ বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

ইমাম হাসান আল বান্নার প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ আমাদের উপর্যুক্ত কথার পক্ষে প্রমাণ। হিজরি ১৩৫৭ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম' শীর্ষক বক্তৃতায় ইমাম বান্না ইসলামের ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতা নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি সেখানে আলোচনা করেছেন ইসলামের সামগ্রিকতা বিষয়ক চিন্তা ও কর্মের পরিধি নিয়ে। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা কী কী কর্মচাঞ্চল্য আনতে পারে- সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

একই বছর ইখওয়ানের ছাত্র শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম বান্না সেখানে দ্বীন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ইসলামি শরিয়তের প্রশস্ততা নিয়ে কথা বলেছেন।
বাদশাহ ফারুক, মিশরের সরকারপ্রধান, মুসলিম বিশ্বের অনেক শাসক, সরকারপ্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ইমাম হাসান আল বান্না একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রটি 'রিসালাতু নাহওয়ান নূর' নামে পরিচিত। ১৩৬৬ হিজরিতে পাঠানো এ চিঠিতে ইমাম বান্না লিখেছেন-
"ইসলামই কর্মতৎপর উম্মাহর সকল রসদের জোগানদাতা।"

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা একটি সমন্বিত জীবনবিধান যা আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। ইমাম হাসান আল বান্নার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়, শিক্ষা, সামাজিক সমতা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার একটি সমন্বিত কাঠামো।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা সমাজে স্থায়ী শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এটি ইতিহাস, দার্শনিক ভিত্তি এবং বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলিম সমাজের জন্য ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা কেবল নৈতিক নির্দেশনা নয়, বরং একটি বাস্তবসম্মত জীবনযাপন ও রাষ্ট্র পরিচালনার মডেল।

ইসলামি ভূখণ্ডে সেক্যুলারিজমের ব্যর্থতা

কোনো ইসলামি দেশে সেক্যুলারিজমের সাফল্য কল্পনা করা যায় না। কেননা এটা ইসলামের প্রকৃতি, মুসলিম জনগণের বিশ্বাস, ইসলামের ধারণা, আচরণ ও ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার কোনো যৌক্তিক কারণ এখানে নেই, যেমনটা খ্রিস্টান-প্রধান পশ্চিমে ছিল।

সেক্যুলারিজম মুসলিম জাতির প্রকৃতি ও দিক পরিবর্তনের চেষ্টা করে; কিন্তু জাতি তাতে সায় দেয় না। সেক্যুলারিজম যা কিছু করতে চায়, জাতির জন্য তা একটি অদ্ভুত ভাইরাসের মতো, যাকে তার অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা [এন্টি ভাইরাস সিস্টেম] প্রবেশ করতে দেয় না; বরং সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। ফলে সেক্যুলার শাসন-ব্যবস্থা ও মুসলিম উম্মাহর মাঝে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এটা কখনো প্রকাশ পায়, কখনো পায় না; কিন্তু তা চলমান ও দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব। কেননা এটা একটা জাতি ও তার জাতশত্রুর মাঝে দ্বন্দ্ব। তা এমন এক আগ্নেয়গিরির মতো, যা একদিন অবশ্যই বিস্ফোরিত হবে।

আর সেক্যুলার ধারা সর্বশক্তি দিয়ে উম্মাহর অগ্রগতি রোধ করে। কারণ, এটা উম্মাহর মাঝে অনুপ্রবেশকারী অচেনা ধারা, যা তার হৃদয়ে ভেতর থেকে নাড়া দেয় না কিংবা তার অস্তিত্বে ঝাঁকি দিতে পারে-এমন ভাষায় কথা বলে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি দেশ, যে দেশটি সেক্যুলার শাসনে পরিচালিত হয়েছে এবং যেখানে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে; অধিকন্তু যারা তার বিরোধিতা করেছে, কঠোরভাবে তাদের দমন করা হয়েছে; এতে করে তাকে রক্তের সাগর পাড়ি দিতে হয়েছে, সে দেশটি তুরস্ক। এটি ছিল ইসলামি খেলাফতের সর্বশেষ দেশ, মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিমা-মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে যাকে পরাস্ত করেছিলেন। তিনি তুরস্কের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তার ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও রীতিনীতি থেকে ভেড়ার চামড়া ছাড়ানোর মতো আলাদা করেছিলেন।

তিনি এমন এক সেক্যুলার সংবিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা জীবন থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। এর ভিত্তিতে এমন সব আইন প্রণিত হয়েছিল, যেগুলো পরিপূর্ণ ইসলাম-বিরোধী; এমনকি পারিবারিক ও ব্যক্তি-সম্পৃক্ত আইনও।

তারপরও কামাল আতাতুর্ক এবং তার উত্তরসূরিরা তাদের সংবিধান, আইন, শিক্ষা, মিডিয়া, সেনাবাহিনী ও পুলিশ এবং তাদের পেছনে পশ্চিমাদের সমস্ত শক্তি নিয়েও কি তুর্কি মুসলিম

জনসাধারণের জীবন থেকে ইসলামি চিন্তা, ইসলামি চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা এবং মূল্যবোধ উপড়ে ফেলতে পেরেছে?

সম্প্রতি যারা তুরস্ক ভ্রমন করেছেন, তারা সেখানে এক গভীর বাস্তবতার সাক্ষী হয়েছেন। সকল বয়সী মানুষের ভিড়-পূর্ণ মসজিদগুলো, হাজার হাজার কুরআনিক স্কুল ও ইমাম-খতিবদের প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ইসলামি বইপত্রের ব্যাপক প্রচার-প্রসার তারই সাক্ষ্য বহন করে। জার্মানিসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে বসবাসরত তুর্কি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের অবস্থা এই বাস্তবতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। বাস্তবতা বলে, 'না' হাজার বার 'না'।
১৮ই জানুয়ারি ১৯৮৩ তে ফরাসি পত্রিকা ল্য মন্ডে ডিপ্লোম্যাটিক-এ "তুরস্ক: পশ্চিমা আধুনিকায়ন ও ইসলামি আভিজাত্য" শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা জার্মানির আখেন শহর থেকে প্রকাশিত আল-রায়েদ ম্যাগাজিনে পুনর্মুদ্রিত হয়। পত্রিকাটি বলেছিল:
দুই শতাব্দীর সংস্কার প্রচেষ্টা-যা তুর্কি সমাজকে পশ্চিমা রীতিতে রূপান্তরিত করতে পরিচালিত হয়েছিল-এবং অর্ধ-শতাব্দীর সেক্যুলার শাসনের পর, আজ তুরস্কে আবার ইসলামের পুনর্জাগরনের কথা শোনা যাচ্ছে। অথচ এটি ছিল প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর একটি, যারা রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করেছিল।

কামাল আতাতুর্কের বিপ্লব তুরস্কে সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রের ভিত ও আধুনিকায়নের মূলমন্ত্রে পরিণত করেছিল। অর্থাৎ, ইসলামকে জন-জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তবে শুধু ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের অন্তরে এর প্রভাব রাখতে পারবে। এভাবে একটি সরকারি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ইসলাম-যা মূলত ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ের সমষ্টি-একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

তবে বাস্তবতা হল, মুসলিম দেশে ইসলামকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা; পশ্চিমা ধাঁচের একটা সেক্যুলার রাষ্ট্র যার পরিচালনা করে। ফলে ইসলাম তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের স্থান থেকে পেছনে সরে আসে এবং আনাতোলিয়ার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এবং প্রায়শ দমন-নিপীড়নের শিকার হতে থাকে।

১৯২৫ সাল থেকে কুরআনিক স্কুল এবং সুফি খানকাগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়, এই অভিযোগে যে, এগুলো পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র।

তবে কি তুর্কি জনমনে ইসলাম নিভে গিয়েছিল? তুরস্কের রাজনীতি থেকে ইসলাম বিদায় নিয়েছিল? বরং এর বিপরীত ঘটেছে। শাসক শ্রেণির ভুবন থেকে ইসলাম হারিয়ে গেলেও; দেশীয় রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইসলামি সংগঠনগুলো

আনাতোলিয়া অঞ্চলের জনমনে তাদের প্রভাব ধরে রেখেছিল; অধিকন্তু নতুন নতুন সমর্থকও লাভ করেছিল।

ইসলামি প্রতীকের প্রতি তুর্কি জনগণের আগ্রহ কেবল নকশবন্দি ও কাদরি সংগঠন দুটির কার্যকলাপের ফলে কিংবা শাসকদের ধর্ম বিরোধিতার কারণে নয়; বরং তুর্কি সমাজের এমন কোনো সামাজিক মডেলকে প্রত্যাখ্যানের কারণে, যা ইসলামি সাংস্কৃতিক কাঠামো থেকে বিচ্যুত। তুর্কি সমাজ এই আশঙ্কাও করে, পশ্চিমা জীবনধারা তুরস্কে বৃদ্ধি পেলে, তুর্কি সাংস্কৃতিক পরিচিতি ধীরে ধীরে মুছে যাবে।

বর্তমানে তুরস্কে ধর্মীয় সংগঠনগুলোর অনুসারীদের সংখ্যা এবং গোপন ইসলামি স্কুলগুলির শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন; কারণ এসব সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলির মতো কাজ করে না। তবে তার কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যায়, আরবাকানের নেতৃত্বাধীন 'জাতীয় মুক্তি পার্টি' নামে একটি দলের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের মাধ্যমে।

সেক্যুলার মূলনীতির বিরোধিতার অভিযোগে এবং আইন ১৬৩-এর বিরোধিতা করায়, তিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন। সেই আইন ধর্মও রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক জীবনের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করে।

বাস্তবতা হল, মুক্তি পার্টি সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রবেশের পর, ১৯৭৩ সালে ১১.৮% ভোট পেয়েছিল এবং ১৯৮০ এর সেপ্টেম্বরে সামরিক অভ্যুত্থানের আগ পর্যন্ত এই অবস্থান ধরে রেখেছিল। অবশ্য সামান্য হ্রাসও পেয়েছিল।

এই পর্যালোচনা থেকে সহজেই ইসলামিক ভূখন্ডে সেক্যুলারিজমের ব্যার্থতা বোঝা যায়। ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের সহাবস্থান একটি অসম্ভব বিষয়।

সেক্যুলারিজম ও ইসলামের দ্বন্দ্ব

সেক্যুলারিজম, যেমনটি আমরা ব্যাখ্যা করেছি, ইসলামের প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে পারে না। এটা কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না; যেমনটা কতক আরব সেক্যুলার দাবি করেছেন। ইসলামের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব।

ইসলাম মানব জীবনের আত্মিক ও বস্তুগত; ব্যক্তিগত ও সামাজিক-সকল দিক অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ সেক্যুলারিজম এই সর্বজনীনতাকে মেনে নেয় না। সুতরাং তাদের মাঝে সংঘর্ষ অনিবার্য।

খ্রিস্টধর্ম মানব ও জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারে। এক অংশ ধর্মের জন্য এবং অন্য অংশ রাষ্ট্রের জন্য। ইনজিলের ভাষায়: এক অংশ ঈশ্বরের, অপর অংশ কায়সারের; সুতরাং যা কায়সারের তা কায়সারকে দাও; আর যা ঈশ্বরের ঈশ্বরকে দাও।

কিন্তু ইসলাম জীবনকে অবিভাজ্য একক হিসেবে দেখে এবং মানুষকে অখণ্ড সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলাম মনে করে, আল্লাহই সমগ্র জীবনের পরিচালক, সমস্ত মানুষের প্রতিপালক; তাই আল্লাহর সাথে কায়সারের অংশীদারত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। আকাশ ও পৃথিবীর সকল সত্তা, এমনকি কায়সার ও কায়সারের অধীন সবকিছুই আল্লাহর তাই জীবনের কোনো অংশকে আল্লাহর নির্দেশনা থেকে দূরে রেখে, ব্যক্তি পরিচালনা করতে পারে না। ইসলাম পুরো জীবনকে তার বিধান ও নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করতে চায়; জীবনকে আল্লাহর রঙে রঙিন করতে চায়।
কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে:

"এবং আল্লাহর রং অপেক্ষা উত্তম রং আর কার হতে পারে!?"(সুরা বাকারা: ১৩৮)

ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিশুদ্ধ আত্মিক প্রভাব বিস্তার করে, যা একদিকে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক অপরদিকে মানবিক। ইসলাম চায় মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি জন্মের আগের এবং মৃত্যুর পরের (কারণ ইসলামে এমন কিছু বিধান ও নির্দেশনা রয়েছে, যা মায়ের গর্ভে থাকা ভ্রুণের জন্য প্রযোজ্য। আবার কিছু বিধান মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য; যেমন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো ও জানাজা পড়া ইত্যাদি) সময়কালেও তার নির্দেশনা ও বিধান মেনে চলুক।

ইসলাম জীবনের মূল অংশ বাদ দিয়ে শুধু প্রান্তিক অংশে অবস্থান করতে চায় না। ইসলাম নেতৃত্ব চায়; কোনো নেতৃত্বের অধীন হতে চায় না।

ইসলামের প্রকৃতিই এমন যে, এটি নেতৃত্ব দেয়, নেতৃত্বাধীন হয় না; শাসক হয়, শাসিত হয় না। কারণ, এটি আল্লাহর বাণী আর আল্লাহর বাণীই সর্বোচ্চ। তাই এটিই সর্বোচ্চ। তার ওপরে কিছু নেই।

সেক্যুলারিজম চায়, ইসলাম তার অধীন হোক, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলুক। সে কামনা করে, ইসলাম যেন আদেশ ও নিষেধ-দাতা, শাসক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে তার প্রাকৃতিক, যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান গ্রহণ না করে।

সেক্যুলারিজম ইসলামকে কেবল তখনই আনন্দচিত্তে স্বাগত জানায়, যখন ইসলাম সীমাবদ্ধ থাকে মিলাদ অনুষ্ঠানে, শোক সভায়, পীরদের খানকায় এবং মিথ্যা কাহিনী ও রূপকথার জগতে। কিন্তু ইসলাম যখন সক্রিয় হয় এবং অন্যদের সক্রিয় করে, তরুণদের পথ দেখায়, জনতার নেতৃত্ব দেয়, শক্তি বিকশিত করে, মন আলোকিত করে, আবেগ জাগিয়ে তুলে, বীর তৈরি করে, পুরুষদের চরিত্র গঠন করে, ন্যায় ও সততার সাথে সমাজ পরিচালনা করে, মানুষের মাঝে ন্যায্যতার মানদণ্ড স্থাপন করে এবং আইন, সংস্কৃতি শিক্ষা ও গণমাধ্যমকে নির্দেশনা দেয়, মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকতে, ভালো কাজের আদেশ দিতে, মন্দ কাজে প্রতিবাদ করতে এবং বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি প্রতিহত করতে শেখায়; তখন সেক্যুলারিজম তা কোনোভাবেই মেনে নেয় না।

সেক্যুলারিজম চায়, ইসলাম জীবনের নির্দিষ্ট একটি দিক অথবা একটি কোণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক; সেটিকে অতিক্রম না করুক। এটা তার পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর অনুগ্রহ। কেননা তার ধারণায় পুরো জীবনই সেক্যুলারিজমের অধীনে থাকা উচিত, যেখানে কোনো প্রতিযোগী কিংবা অংশীদার থাকবে না।

সেক্যুলারিজমের মতে ইসলামের উচিত:

- শুধু রেডিও বা টেলিভিশনে ধর্মীয় আলোচনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।
- পত্রিকায় কেবল শুক্রবারে ধর্মীয় কলাম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।
- সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়টুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।
- রাষ্ট্রীয় আইনে কেবল পারিবারিক আইন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেবল মসজিদ নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকা।
- সরকারি দপ্তরে কেবল ওয়াকফ মন্ত্রণালয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

সেক্যুলারিজম চায়, ইসলাম এই সীমিত বিষয়সমূহে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকুক; এর চেয়ে বেশি কিছু না চাক। বরং ইসলাম যেন তার প্রতি এই কারণে কৃতজ্ঞ থাকে যে, সে ইসলামকে এসব সীমিত ক্ষেত্রে জানালা ও কুঠুরিতে উঁকি দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু ইসলাম স্বভাবতই এই সীমাবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ইসলাম জীবনের একটি অংশ নয়; বরং এটি পুরো জীবনের পথপ্রদর্শক ও নির্মাতা। ইসলাম সেক্যুলারিজমের আতিথেয়তা প্রত্যাখ্যান করে; কেননা সে নিজেই মেজবান।
এই কারণে ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘাত এক বা দুই বিষয়ে নয়; বরং ইসলামের চারটি মৌলিক শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সংঘাত বিদ্যমান:

১. আকিদা (বিশ্বাস): ইসলামি আকিদা একজন মুসলিমের ওপর এই দায়িত্ব আরোপ করে যে, সে তার জীবনকে এই বিশ্বাস-বিধি মোতাবেক সাজাবে। তার আচরণ এবং সম্পর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটাবে; সে শাসক হোক কিংবা শাসিত।

কিন্তু সেক্যুলারিজম চায়, আকিদা কেবল ব্যক্তির অন্তরে লুক্কায়িত থাকুক; জীবন পরিচালনায় তার ভূমিকা না থাকুক। তার ধারণা, যদি তা প্রকাশের অনুমতি পায়ও, তবে তা মসজিদের চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশ্য মসজিদও তার নিয়ন্ত্রণাধীন হবে।

সেক্যুলার শাসনের অধীনে বসবাসকারী একজন মুসলিম তার বিশ্বাস, আকিদা ও বাস্তবতার মধ্যে একটি গভীর দ্বন্দ্বে ভোগেন। তার আকিদা পূর্বমুখী হলে বাস্তবতা পশ্চিমমুখী হয়; তার আকিদা কিছু বিষয় নিষিদ্ধ করলে, সেক্যুলারিজম সেগুলো বৈধ করে ফেলে। তার আকিদা যা আবশ্যক করে, সেক্যুলারিজম তা প্রত্যাখ্যান করে।

এভাবে দেখা যায়, প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে মূল সেক্যুলারিজমের সহাবস্থান সম্ভব নয়। এ দুটি দুই সতিনের মতো, যাদের একজনকে সন্তুষ্ট করলে অপরজন অসন্তুষ্ট হয় কিংবা পাল্লার মতো, যার এক দিক ভারী হলে অপরদিক হালকা হতে বাধ্য।

২. ইবাদত (বন্দেগি): সেক্যুলারিজম ইসলামকে হয়তো একটি ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে না, যার দ্বারা মানুষ তার প্রভুর কাছে নিকটতর হতে চায়, কারণ এটি ধর্মীয় স্বাধীনতার অংশ হিসেবে ধরা হয়। তবে এই ইবাদতকে জীবনের লক্ষ্য কিংবা মানুষের প্রধান কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত: ৫৬)

সেক্যুলারিজম তার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যমে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, যাতে এই বিষয়টি সুসংহত এবং ফলপ্রসূ হয়।

এছাড়া, এটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনকে এমনভাবে সংগঠিত করে না, যাতে মুসলিমদের ইবাদত পালন করতে কোনো বাধা বা চাপ না থাকে; এবং কাজের শিডিউল, পড়াশোনা ও অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে ফরজ নামাজের সময়সূচির বিরোধিতা না হয়।
এটি ফরজ ইবাদত পালন বা অবহেলা করার ওপর ভিত্তি করে মানুষের অগ্রাধিকার বা পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলে না; বিশেষত নেতৃত্বের পদে প্রার্থিতা ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময়। সেখানে একটি ভুল ধারণা কাজ করে: ব্যক্তি সত্তা এবং সামাজিক আচরণের মধ্যে বিভেদ। ইসলাম এমন কোনো ধারণা গ্রহণ করে না।

এছাড়া, সেক্যুলারিজম মনে করে না যে, ইবাদত ত্যাগের প্রকাশ্য ঘোষণা-যা ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী একটি গুরুতর অপরাধ-এমন বিষয়, যা বিচার-বিবেচনা বা শাস্তির যোগ্য। যে ব্যক্তি বারবার নামাজ ত্যাগ করে এবং যাকাত প্রদান করে না কিংবা রমজানে সিয়াম পালন করে না, তার ওপর সর্বসম্মত ইসলামি ফিকহ অনুসারে শাস্তি আরোপ করা হয়। এবং যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, কিংবা আবশ্যকতা অস্বীকার-পূর্বক তা ছেড়ে দেয়; ধর্মের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়সমূহ অস্বীকারের কারণে তার কুফরির ব্যাপারে সবাই একমত।

এছাড়া, সেক্যুলারিজম যাকাতকে -যা ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তম্ভের একটি অংশ- তার আর্থিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গ্রহণ করে না। বরং এটাকে একটি ব্যক্তিগত ইবাদত হিসেবে গণ্য করে; যা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে পালন করতে পারে-তবুও তাকে ট্যাক্স পুরোপুরি আদায় করতে হবে-এবং কেউ চাইলে এটি উপেক্ষা করতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই বা অভিযোগ নেই।

৩. আখলাক (নৈতিকতা): পশ্চিমা ধাঁচের সেক্যুলারিজম নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান এবং নির্দেশনাগুলোকে সহজভাবে গ্রহণ করে না। তারা মনে করে না যে, সমাজকে এসব বিধি-নিষেধে আবদ্ধ রাখা উচিত। বরং তারা নারী-পুরুষের উন্মুক্ত মেলামেশা এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী আচরণের স্বাধীনতাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে।

এই বিষয়টি ইসলাম এবং সেক্যুলারিজমের মধ্যে অন্যতম প্রধান সংঘর্ষের ক্ষেত্র। ইসলাম কঠোরভাবে সেইসব পথ বন্ধ করে দেয়, যা ফিতনার বাতাস বইয়ে আনে, যেমন অশ্লীল গান, উত্তেজক ছবি, উন্মুক্ত কাহিনি এবং প্ররোচনামূলক পোশাক। ইসলাম নারী-পুরুষের অবৈধ একাকী মিলনকে নিষিদ্ধ করে এবং বৈধ বিয়ের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে সক্রিয়

ভূমিকা পালন করে; যাতে মানুষ বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং হারামের প্রতি না ঝোঁকে।

অপরদিকে, সেক্যুলারিজম এসব বিষয়কে এমন কোনো সমস্যা মনে করে না, যার সমাধান প্রয়োজন। নারী-পুরুষ একে অপরের উপভোগ করাকে তারা একটি স্বাভাবিক বিষয় মনে করে; যেমনটা বর্তমানে উন্নত সমাজে প্রচলিত। ইসলাম এ ক্ষেত্রে যে কঠোর নীতিগুলো অনুসরণ করে, সেগুলোকে সেক্যুলারিজম 'অতি রক্ষণশীল' এবং 'জটিল' বলে মনে করে। তাদের মতে, ইসলামি চিন্তাবিদগণ এই বিষয়টিকে অযথা বড়ো করে দেখান এবং যৌনসম্পর্কের বিষয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

ইসলামি চিন্তাবিদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুধু এটুকুই যে, তারা আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হালাল বলেন এবং যা হারাম করেছেন, তা হারাম বলেন। তারা আল্লাহ যা বাধ্যতামূলক করেছেন, তা পালন করার আহ্বান জানান এবং আল্লাহ যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন, তা মেনে চলতে বলেন। একজন প্রকৃত মুসলিম কি এসবের বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারে?

সেক্যুলাররা নৈতিকতাকে ধর্মের সাথে যুক্ত করতে চায় না। তারা নৈতিকতাকে ধর্মীয় ভিত্তির পরিবর্তে দার্শনিক বা প্রচলিত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চায়। ধর্মীয় নৈতিকতাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে এবং তারা মনে করে, নাগরিক নৈতিকতা আরও সঠিক এবং উত্তম পথ।

৪. শরিয়া (আইন ও বিধান): সেক্যুলারিজম হয়তো আল্লাহকে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করে; কিন্তু তার শাসন ও বিধান দেওয়ার অধিকারকে অস্বীকার করে। অথচ ইসলাম এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই শাসক। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

“জেনে রেখো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।” (সূরা আ’রাফ: ৫৪)

সেক্যুলারিজম যদি কোনোভাবে আল্লাহর বিধান দেওয়ার অধিকার স্বীকার করে; তাহলেও আমরা দেখতে পাই, তা মানুষকে সেই বিধান বাতিল বা পরিবর্তন করার অধিকার দিয়ে দেয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনোরকম প্রমাণ ছাড়া, ভিত্তিহীন অজুহাতে। এটা আল্লাহ যে জিনিস নিষিদ্ধ করেছেন, তা বৈধ ঘোষণা করে এবং যা বৈধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে। এটা আল্লাহ কর্তৃক ফরজকৃত বিধানগুলো বাতিল করে এবং শরিয়ার আইনগুলো অকার্যকর করে দেয়।

সেক্যুলারিজমের অন্তরে আল্লাহর প্রতি যথাযথ মর্যাদাবোধ নেই। সে মনে করে, পরিবর্তনশীল যুগ, স্থান এবং মানুষের বিবর্তনের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী নন।

সে অসম্ভব মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালা এমন বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেন, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং তাদের উন্নতি সাধনে কার্যকর, তা ব্যক্তি হিসেবে হোক বা সমাজের অংশ হিসেবে। এমনকি এ বিধান ও নীতিমালা প্রবর্তিত হওয়ার পর চোদ্দো শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও, তা আজও সমান কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে।

অথচ ইসলাম এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ। আসমান-জমিনে কণার সমান কোনো জিনিসও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-সবই আল্লাহ তায়ালার সমানভাবে জানা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"বস্তুত যে কোনো অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোনো অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোনো কাজই তোমরা কর, আমি তোমাদের খুব নিকটে থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, না জমিনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোনো কিছু আছে, না বৃহৎ; যা এই সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" (সুরা ইউনুস: ৬১)

ইসলামি দেশগুলোতে সেক্যুলারদের প্রধান শত্রু 'ইসলামি শরিয়া'। কারণ, শরিয়াই ইসলামের আদর্শিক ও তাত্ত্বিক অবস্থানকে বাস্তবতার ময়দানে এনে কার্যকর করে। এটি সমাজের জন্য এমন একটি সুরক্ষাবলয় তৈরি করে, যা অন্যায়কারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি, যারা ইমানের প্রেরণায় আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তাদেরকে প্রতিরোধ করে। যেমন তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রা. বলেছেন:

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শাসনের মাধ্যমে এমন অনেক কিছু প্রতিরোধ করেন, যা কুরআনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায় না।

সেক্যুলাররা শরিয়ার প্রতি সবচেয়ে বেশি বৈরিতা প্রদর্শন করে সেই বিষয়গুলোতে, যেগুলি পশ্চিমা সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের আইন প্রণয়নের দর্শন এবং ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে তাদের ধারণার বিপরীত। যেমন: দেওয়ানি আইনে সুদ নিষিদ্ধকরণ, ফৌজদারি আইনে ব্যভিচার ও মদপান নিষিদ্ধকরণ কিংবা অপরাধের জন্য দণ্ড নির্ধারণে শারীরিক শাস্তি দেওয়া-যেমন: চাবুক মারা, হাত কেটে দেওয়া ইত্যাদি।

সেক্যুলারিজম এমন আইন গ্রহণ করে, আমাদের ভূখণ্ডে যার কোনো ঐতিহ্য, শেকড় বা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা নেই। কিন্তু তারা সেই শরিয়া প্রত্যাখ্যান করে, রাব্বানিয়াত (ঐশ্বরিকতা), ন্যায়পরায়ণতা, পরিপূর্ণতা এবং স্থিতিশীলতার জন্য জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যাকে মান্য করে। তারা শরিয়ার বিধান এড়িয়ে চললে গুনাহের বোঝা ও উদ্বেগ অনুভব করে এবং মনে করে যে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হবে।

মানদণ্ড নির্ধারণ

প্রাগুক্ত পদ্ধতিতে পরিচয় বা অবস্থান নির্ধারণ এবং ধারণাগুলি সুনির্দিষ্ট করার পর মানদণ্ড নির্ধারণ করা খুবই সহজ। মানদণ্ড নির্ধারণ বলে সেই সব দাঁড়িপাল্লাকে বোঝাতে চাইছি, মতভেদের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের জন্য যা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি এমন কোনো মানদণ্ড না থাকে, যাকে উভয় পক্ষ মেনে নেয়; তাহলে বিরোধ চলতেই থাকবে, কোনো মীমাংসা হবে না। সমাধান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কেননা প্রত্যেক পক্ষই দাবি করবে যে, তাদের অবস্থান সঠিক ও নিভুল, তারাই সত্যের পক্ষে।

মানুষ বস্তুগত বিষয়ে কিছু মানদন্ডে একমত হয়েছে। যেমন: ওজনের জন্য দিরহাম, রিতল ও কিলোগ্রাম; দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে হাত-পা ও মিটার। তেমনই নৈতিক বিষয়েও এমন মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন, যা বিরোধ নিষ্পন্ন করবে এবং দ্বন্দ্ব দূর করবে।

একসময় মানুষের ধারণা ছিল, অ্যারিস্টটলের আনুষ্ঠানিক তর্কের যুক্তি একটি সত্য মানদণ্ড হতে পারে। তারা এটাকে আইনি পদ্ধতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিল, যা অনুসরণ করলে চিন্তাগত ভুল থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু এ সমস্ত যুক্তি প্রতিপক্ষের গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ, যদি তা মূলে সত্য নাও হয়। ফলে সেই যুগে যুক্তি-তর্কের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ তীব্র বিরোধে লিপ্ত ছিল। যুক্তিতর্ক তাদের কোনো কাজে আসে নি।

কথা হতে পারে এমন কিছু সাধারণ মানবিক মানদণ্ড নিয়ে, যেগুলো সব সময় ও সকল স্থানে গ্রহণযোগ্য। যেমন: বিবেক, জ্ঞান বা বিজ্ঞান এবং কল্যাণ।

কিন্তু এই মানদণ্ডসমূহের সমস্যা হল, প্রত্যেকেই এসবের দাবি করে অথচ তাদের মাঝে পুব-পশ্চিমের দূরত্ব কিংবা আসমান জমিনের বৈপরীত্য বিদ্যমান।

লিবারেল ব্যক্তি দাবি করে, তার মতবাদই বিবেক ও জ্ঞানের চূড়ান্ত রূপ। এটা মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে। সমাজতন্ত্রী তার এই দাবিকে খণ্ডন করে এবং ঘোষণা করে, একমাত্র সে-ই বিবেক বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রকৃত কল্যাণের প্রতিনিধত্ব করে। তৃতীয়জন না এটার পক্ষে, না ওটার পক্ষে।

প্রাচীন ও আধুনিক যুগের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মতবাদগুলো লক্ষ করলে সত্যতা প্রমাণে কেউ হ্যাঁ বলেন, তো কেউ না বলেন। কেউ আবার দেখতে পাই, তাদের কেউ পুবের দিকে ঝোঁকেন, তো কেউ পশ্চিমের দিকে। সংশয়বাদী, হ্যাঁ বা না-কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না।

তাদের কেউ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী, কেউ আবার অবিশ্বাসী। কেউ আদর্শবাদী, কেউ আবার বস্তু ও বাস্তববাদী। প্রত্যেকেই তার মতবাদ ও দর্শনের ভিত্তি গড়েন বুদ্ধিবৃত্তির ওপর, যা তার কাছে যথাযথ মনে হয়। তবে বিরোধীরা তার খণ্ডন করেন এবং তাকে বাতিল সাব্যস্ত করেন; ঠিক যেমন তার সমর্থকেরা তার পক্ষে লড়েন, যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করান এবং বিরোধীদের জবাব দেন।

একারণেই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আরেকটি আলো প্রয়োজন, যা তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে এবং দিক-নির্দেশনা দেবে। সেই আলো হল ঐশ্বরিক ওহি; যেমনটি ইমাম মুহাম্মাদ আবদু তার 'রিসালাতুত তাওহিদ' বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

ওহি বুদ্ধিমত্তার কার্যকারিতা নিষ্প্রয়োজন করে দেয় না। বরং তার হাত ধরে, অন্ধকার গলিপথ ও দ্বিধান্বিত স্থানে তাকে পথ দেখায়; যেখানে বিভ্রান্তি বা ভুলের সম্ভাবনা কিংবা-মানবিক দুর্বলতার সুযোগে প্রবৃত্তির জয় লাভের সম্ভাবনা বেশি।

এ কারণেই বিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহর ওহি অর্থাৎ ইসলামই হবে চূড়ান্ত রেফারেন্স ও মানদণ্ড। তবুও আমরা বুদ্ধিমত্তা, বিজ্ঞান ও কল্যাণের বিচারকে সাধুবাদ জানাই, যতক্ষণ পর্যন্ত:

এক, বুদ্ধিমত্তা নিখুঁত থাকে, সন্দেহ বা অনুমান দ্বারা কলুষিত না হয় এবং নিশ্চিত পূর্বানুমানের অবধারিত ফলাফলে পৌঁছয়।

দুই, জ্ঞান বা বিজ্ঞান প্রমাণিত এবং স্থায়ী হয়। কেবল অনুমান-নির্ভর বা তত্ত্বভিত্তিক না হয়। কেননা এগুলো একটি অপরটির বিপরীত হয়; যেমনটা দেখা যায় মানবিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

তিন, কল্যাণ হয় প্রকৃত; কল্পিত নয়। এমন কল্যাণ, যা ব্যক্তি-কৈন্দ্রিক ও সামাজিক; বস্তুগত ও অর্থগত; পার্থিব ও পরকালীন-সব দিক বিবেচনা করে।

আমরা মুসলিমগণ কখনো বিবেক, বিজ্ঞান ও কল্যাণের বিচারে ভয় পাই না। এগুলো সর্বদা আমাদের পক্ষে থাকে এবং এগুলো পেয়ে আমরা সুখী।

কিন্তু আমাদের দেশে সেক্যুলারিজম-তা যেকোনো মানদণ্ডেই হোক-সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। কেননা এটা আমাদের ধর্ম-বিরোধী, সংবিধান পরিপন্থি, মানবাধিকার পরিপন্থি এবং জাতির কল্যাণ ও ঐতিহ্য-বিরোধী।

ঐশ্বরিক মানদণ্ড ওহি

নিঃসন্দেহে আমাদের মানদণ্ড হচ্ছে ঐশ্বরিক মানদণ্ড, তথা আল্লাহর ওহি বা প্রত্যাদেশ, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যেন তারা এমন বিষয়ে সঠিক দিশা

পায়; যেখানে বিবেক পৌঁছাতে পারে না। এবং যেন তারা চিন্তা-ভাবনার বিভ্রান্তি, মতামতের পরস্পর-বিরোধিতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে তার সাহায্য নিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিম বলছে:
"সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসেবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন।" (সুরা বাকারা: ২১৩)

ঐশী প্রত্যাদেশ বা ওহি বর্তমানে ইসলামেই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আসমানি রিসালাত শেষ করেছেন এবং আসমানি কিতাবের সমাপ্তি টেনেছেন।

যেহেতু আমরা মুসলিম-আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসেবে মেনে নিয়েছি এবং কুরআনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছি-তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, যেকোনো দ্বন্দ্বে বা মতভেদে আমরা ইসলামের কাছেই ফিরে যাব। কেননা এটি সৃষ্টিগতভাবেই আমাদের পথপ্রদর্শক।

ইসলামের কাছে বিচার চাওয়ার অর্থ হল, কুরআন ও সুন্নাহর কাছে বিচার চাওয়া। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়াও, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে ন্যস্ত কর; যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" (সুরা নিসা: ৫৯)

মুসলিম উম্মাহ একমত, আল্লাহ তায়ালার দিকে ফেরা মানে তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের কাছে ফিরে যাওয়া; আর রাসুলের দিকে ফেরা মানে তাঁর সুন্নাহর কাছে ফিরে যাওয়া।
যদি বলা হয়, মানুষ কুরআন ও সুন্নাহকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝে, এবং ব্যাখ্যা করে। তাহলে আমরা বলব: নিশ্চিত বিষয়াদি, যার ওপর উম্মাহ প্রজন্মের পর প্রজন্ম একমত এবং কুরআনের মুহকাম আয়াত ও সহিহ সুন্নাহ দ্বারা যেসব বিষয় প্রমাণিত; সেসব বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই।

আর যেসব বিষয় অনুমান নির্ভর, সেগুলো অবশ্যই নিশ্চিত বিষয়ের আলোকে বুঝতে হবে। এই জন্য মুসলিম আলেমগণ যেসব নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন, তা মেনে চলতে হবে। এসব

নীতিমালা ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি, হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি ও তাফসিরশাস্ত্রের মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইসলাম-সম্পৃক্ত বিষয়ে তার দিকেই ফেরা। যদি কেউ বলে: ইসলাম কেবলই একটি ধর্ম, যা আত্মার পরিশুদ্ধি ও ইবাদত-প্রতিষ্ঠায় সীমাবদ্ধ; রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি কিংবা অর্থনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই; তাহলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ইসলামের কাছে ফিরে যেতে হবে; যেন তার মূল উৎসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলাম কি কেবল আকিদা ও ইবাদত নাকি এটি আকিদা-শরিয়া, দাসত্ব-নেতৃত্ব, ধর্ম-রাষ্ট্র ও কুরআন-তরবারি-এসবের সমষ্টি।

এটা মূলত ইসলামের ব্যাপকতা বা সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা কেবলই ইসলামের এবং তার কুরআন ও তার নবির সুন্নাহর; খুলাফায়ে রাশেদিনের পথনির্দেশনা ও উম্মাহর মুজতাহিদগণের ঐকমত্যের।

যদি কিছু লোক ধর্মকে 'হ্যাঁ' কিন্তু রাষ্ট্রকে 'না' বলে অথবা আকিদাকে 'হ্যাঁ' কিন্তু শরিয়াকে 'না' বলে কিংবা কুরআনকে 'হ্যাঁ' আর তরবারিকে 'না' বলে-তাহলে আমরা তাদের বলব, আপনাদের যা ইচ্ছা বলুন, আপনাদের প্রবৃত্তি ও সংস্কৃতি যা চায় বলুন; কিন্তু ইসলামের নামে তা বলবেন না। কেননা কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে-

“আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।” (সুরা নাহল: ৮৯)

ইসলামের ফকিহ ব্যক্তিবর্গ সর্বসম্মতভাবে এলান করেন: ইসলামের শরিয়া মানুষের সব কাজের ওপর প্রযোজ্য-তা ব্যক্তি-কৈন্দ্রিক হোক কিংবা সামাজিক। তাদের কোনো কাজই শরিয়ার শাসনের বাইরে নয়। সকল কাজের ক্ষেত্রেই শরিয়া তার প্রসিদ্ধ পাঁচটি বিধানের কোনো না কোনো একটি প্রদান করে।

অতএব, উল্লিখিত কোনো একটি মানদণ্ডের সাহায্যে যদি সেক্যুলারিজমের বিচার করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, এটা আমাদের দেশে সব দিক থেকেই অগ্রহণযোগ্য-আকারে অগ্রণযোগ্য; বিষয়বস্তুর দিক থেকেও অগ্রহণযোগ্য। আইনের লোকেরা যেমনটা বলেন, ধর্মের মানদণ্ডেও তা প্রত্যাখ্যাত এব অন্যান্য মানদণ্ডেও তা প্রত্যাখ্যাত।

সেক্যুলারিজমের ইসলামিকরণ কি আদৌ সম্ভব?

সেক্যুলারিজমকে যারা ধর্মীয় পোশাক পরাতে চায়, তারা তাদের এই জঘন্য কর্মের পেছনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে মদিনা সনদকে। 'মদিনা সনদ'কে সামনে রেখে তারা মানুষকে দেখাতে চায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। যে রাসুলকে প্রেরণই করা হয়েছে ইসলামকে সমস্ত ধর্ম, মতবাদ ও ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে সকল বাতিল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, তার ব্যাপারে এমন দাবি করা যে জঘন্য অপবাদ-তা একজন চিন্তাশীল সাধারণ মুসলিমেরও বুঝে আসার কথা। এই দাবি এতটাই অনর্থক যে, এটাকে খণ্ডন করা কেবল সময় নষ্ট করা হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের এতটাই অধঃপতন হয়েছে যে, বর্তমান বাস্তবতায় মুসলমানরা এই দাবিকেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। তাই কালের বিবর্তনে সেই সময় নষ্ট-করা কাজটিই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখানে একেবারে সংক্ষেপে মদিনা সনদের ব্যাপারে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরা হয়েছে।

এক, ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সালাফদের কেউই ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে মদিনা সনদের টার্ম ব্যবহার করেননি এবং কেউই মদিনা সনদকে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সাব্যস্ত করেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে সাহাবিদের যুগ পেরিয়ে ইমাম-সালাফদের কারো কাছ থেকেই এটা প্রমাণিত নয়।

দুই, মদিনা সনদ কেবল একটি প্রতিরক্ষামূলক অঙ্গীকারনামা, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক অবস্থায় শত্রু না বাড়িয়ে বরং এক শত্রুর বিরুদ্ধে আরেক শত্রুকে ব্যবহার করা। আর কোনো অঙ্গীকারনামা কখনোই মৌলিক ভিত্তি হতে পারে না। কারণ অঙ্গীকারনামা অস্তিত্বে আসেই একটা সাময়িক এবং আপাত-পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, যা চূড়ান্ত কিছু হয় না। যেমন হুদায়বিয়ার চুক্তির কথাই ধরা যাক। সেখানে চুক্তির একটি বিষয় ছিল কোনো কাফের মুসলমান হয়ে রাসুলের কাছে চলে এলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এটা ছিল সাময়িক সিদ্ধান্ত। মৌলিকভাবে ইসলাম কখনোই এটা সমর্থন করে না।

তিন, মদিনা সনদ কেন ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না এর সবচেয়ে বড় সত্য উত্তর হলো, ইসলামি শরিয়ত তখনো অপূর্ণাঙ্গ ছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অনেক বিধান এসেছে, যা মদিনা সনদে ছিল না। এমনকি তখন জিজিয়ার বিধানও ছিল না। ফলে মদিনা সনদ চূড়ান্ত এবং অকাট্য কোনো বিষয়ের মধ্যে পড়ে না যে, কেবল এর ভিত্তিতেই একটি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

চার, সর্বশেষ বিষয় হলো, কেউ যদি মদিনা সনদের ধারাগুলো ভালোভাবে লক্ষ করে তবে সেখানে সে কোনোভাবেই সেক্যুলার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাবে না। কারণ মদিনা সনদের অন্যতম প্রধান ধারাই হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া। এই ধারাটি এতটাই সামগ্রিক যে মদিনা সনদের পরে আসা শরিয়তের সমস্ত বিধান শামিল করে নেয় এবং এই ধারার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়াই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি; মদিনা সনদ নয়।

এছাড়াও কেউ কেউ সেক্যুলারিজমকে তার পারিভাষিক রূপ থেকে বের করে এর ইসলামি সংজ্ঞা দাঁড় করাতে চায়। এখানে কিছু সমস্যা আছে।

প্রথমত, বিজাতীয় যেকোনো পরিভাষাকে ইসলামিকরণ করা শরিয়ত-সমর্থিত নয়। ধরা যাক আমরা সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি আর সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি আমরাও সেক্যুলারিজমকে আদর্শিকভাবে বিশ্বাস করি। এখানে সূক্ষ্ম পয়েন্ট হলো, আমরা আদর্শিকভাবে সেক্যুলারিজমকে একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিচ্ছি। এখানে যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, সেক্যুলারিজম ফোকাসিং হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ইসলামই যে একমাত্র মানদণ্ড, কুরআন-সুন্নাহই একমাত্র সত্য বাকি সব মিথ্যা, শরিয়তই একমাত্র নৈতিকতা এবং আদল-নিজেদের এই মানদণ্ড এবং দাবির জায়গায় আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি। এটা প্রথম সমস্যা যে আমরা মানদণ্ডের জায়গাতেই হেরে যাচ্ছি। আর বিশ্বব্যাপী তাদের মানদণ্ডই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাদের মানদণ্ডকে মেনে নিয়ে নানান ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে চাচ্ছি। মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নানা ব্যাখ্যা আওড়িয়ে বলেননি যে ইসলামেও কুফর আছে। কুফর কুফরই, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

এর আরেক সমস্যা হলো, মানুষকে আমরা লুকোচুরির মাধ্যমে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছি যে, আমরাও সেক্যুলারিজমের চর্চাকারী। এটা কখনো মানুষকে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য নৈতিক কিংবা আদর্শিকভাবে প্রস্তুত করবে না। দিনে দিনে তাদের মনে সেক্যুলারিজম নামক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেক্যুলারিজমের ভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া বলয় দিন দিন মূলধারার সেক্যুলারিজমেই ফিরে যাবে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর বাস্তবতা বিষয়টি আরো শক্তভাবে প্রমাণ করছে। বিভিন্ন দেশের নানা ইসলামি গণতান্ত্রিক দল ইসলামি ভাবধারা ও গঠনতন্ত্র বাদ দিয়ে ক্রমে ক্রমে আরও সেক্যুলার হয়েছে এবং হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যাকাররা এর ইসলামি কাঠামোও দেখাতে পারছে না। সেক্যুলারিজমের যে কাঠামো তারা দেখানোর চেষ্টা করে, তা আসলে ইসলামসমর্থিত কাঠামো নয়। তারা সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিকটাই ইসলামি হিসেবে দেখাতে চায় (আর এজন্যই

তারা এরদোগানের তুরস্ককে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে। অথচ এরদোগানের দেশেও যেই সেক্যুলারিজমের চর্চা হয়, তা কখনোই ইসলামসমর্থিত নয়)। যেমন, যদি কেউ বলে সেক্যুলারিজমের মানে হলো সকল ধর্ম ও মতের প্রতি উদার এবং নিরপেক্ষ হওয়া, তা হলে তার এই দাবি ভুল। কারণ সেক্যুলারিজমের এই কাঠামোকেও ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্ম ও মতকে সমান অধিকার দেয় না। যেমন, সেক্যুলারিজম তার বাইরের কোনো মতকে সহ্যই করে না।

তৃতীয়ত, তারা যাকে সেক্যুলারিজম বলছে, তা আসলে সেক্যুলারিজম নয়। যেমন, ট্রাফিক আইন কিংবা বর্তমান সময়ের নতুন কোনো বিষয়ের আইনকে ইসলামি শরিয়ত সেক্যুলারিজম বলে না। ইসলামে এটাকে কিয়াস কিংবা ইজতিহাদ বলে। সেক্যুলারিজমকে ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উপেক্ষিত হয়, তা হলো তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত হলো রাষ্ট্রে ফয়সালা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র ভিত্তি আল্লাহর শরিয়াহ হওয়া। আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা রায় প্রদানের চর্চা থাকা। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিই হচ্ছে এই হাকিমিয়্যাত। এটাকে আরো মজবুত করার জন্য 'দার'-এর প্রসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে। দারুল ইসলাম কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় সালাফরা যে বিষয়টি মুখ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তা হলো ইসলামি শরিয়াহ বিজয়ী হওয়া। ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকা। এ কারণেই ইসলামি ইমামাতের বাইয়াতই সংঘটিত হয় আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের উপর।

সুতরাং ব্যভিচারের অনুমোদন না দেওয়া, সুদের প্রচলনের সুযোগ না দেওয়া, জিম্মিদের থেকে ট্যাক্স নেওয়া, হুদুদ বাস্তবায়ন করা- এসব হাকিমিয়্যাতেরই অংশ। মুসলিমদের ব্যাপারে যে আদেশ-নিষেধ আছে, তা বাস্তবায়ন করা এবং অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রে যে নির্দেশনা রয়েছে, তা প্রয়োগ করাও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে অমুসলিমরা কোনো চুক্তি ভঙ্গ করলে, তার ব্যবস্থা নেওয়াও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। আবার নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার করাটাও হাকিমিয়্যাহর আওতাভুক্ত। মোটকথা, ইসলামি শরিয়াহ ও আহকামকে বিচারকের মর্যাদা দেওয়া হলো হাকিমিয়্যাহ, যা প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তার রাসুলকেই বিচারক মানা। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাতকে না বুঝার কারণে তারা দুইভাবে ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

এক. মুজতাহিদদের কর্ম ও সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নকে গুলিয়ে ফেলা। মুজতাহিদদের কাজ হলো কুরআন-সুন্নাহর প্রিন্সিপাল অনুযায়ী নতুন কোনো বিষয়ের শরয়ি হুকুম বের করা। তাদের কাজের ভিত্তি থাকে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের বুঝ ও ব্যাখ্যা। সালাফদের বুঝকে পুঁজি করেই তারা ইজতিহাদ করেন। তারা নতুন নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন না এই ক্ষেত্রে।

যারাই সালাফদের বুঝের বাইরে নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাইবে, তারাই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

অন্য দিকে সেক্যুলারদের আইনের ভিত্তি থাকে মানবীয় প্রবৃত্তি ও বিবেক। তারা আল্লাহর হাকিমিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করে, যাকে মহান আল্লাহ জাহিলিয়্যাতের হুকুম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (সুরা মায়িদা, আয়াত ৫০)। সুতরাং মুজতাহিদদের কর্ম এবং সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য নেই। উভয়ের মাঝে বরং তাওহিদ ও শিরকের সম্পর্ক। একটি ঈমান, অপরটি কুফর।

দুই, ইসলামি শরিয়তকে অপূর্ণাঙ্গ এবং অপর্যাপ্ত হিসেবে দেখানো। এমন দাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের দ্বিন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক(সুরা মায়িদা, আয়াত ৩)। আমরা জানি আমাদের দ্বিন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য পালনীয় একমাত্র দ্বিন। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই ইসলামি শরিয়তে মানবজাতির পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের সমাধান ও নির্দেশনা পূর্ণরূপে থাকবে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

“আমি আপনার কাছে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণী হিসেবে।” (সুরা নাহল, আয়াত ৮৯)

ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ এই শরিয়তকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যার মাঝে মানুষের ইবাদত ও দায়িত্ব পালন এবং জীবন পরিচালনার প্রয়োজনীয় সমস্ত দিকনির্দেশনার সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দ্বিনের পরিপূর্ণতা লাভের স্বীকৃতি নিয়েই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।” (সুরা মায়িদা, আয়াত ৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করবে এই দ্বিন পূর্ণাঙ্গ নয়; পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আরো কিছু বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে, সে আল্লাহর এই আয়াত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হবে। দ্বিন পরিপূর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, মানব-জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে শরিয়ত মৌলিকভাবে কোনো না কোনো নির্দেশনা দিয়েছে। অর্থাৎ একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন এসব মূলনীতি থেকে শাখাগত বিষয়ের সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব মুজতাহিদদের উপর ন্যস্ত থাকবে (আলই'তিসাম-

৪৯১; ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন- ১/৩৩২-৩৩৪; আলমুওয়াফাকাত- ২/৭৯)। মনে রাখতে হবে শরিয়তের মূলনীতি মেনে মুজতাহিদগণ নব উদ্ভাবিত যেসব বিষয়ের মাসআলা বের করেন, যদিও তা বাহ্যত মানবীয় সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্যই 'বিমা আনযালাল্লাহ' (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন) এর অন্তর্ভুক্ত; যদিও তা প্রকাশ পায় একজন মুত্তাকি মুজতাহিদের গবেষণার মাধ্যমে। কারণ, এখানে মূলনীতি মানা হচ্ছে শরিয়তকে।

আমাদের শরিয়ত পরিপূর্ণ। মানব-জীবনের এমন কোনো অধ্যায় নেই, যার ব্যাপারে শরিয়ত বৈধতা বা অবৈধতার আদেশ-নিষেধ জারি করেনি। এখন হতে পারে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে অথবা কোনো মূলনীতির আওতায় এর আলোচনা রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন কোনো নতুন বিষয় সামনে আসেনি, যা ইসলামের কোনো মূলনীতির আওতায় পড়েনি কিংবা তার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম প্রয়োগ করা যায়নি। শরিয়ত নির্দিষ্ট; কিন্তু ব্যাপক। কিয়ামত পর্যন্ত যত বিষয় আসবে ও ঘটবে, শরিয়ত সবকিছুর জন্য যথেষ্ট। এই শরিয়তে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির যেকোনো সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

সেক্যুলারিজমের ক্ষতিকর দিক

সেক্যুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে মুসলিমদের দ্বিন ও দুনিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে আমরা তার কিছু কুফল বর্ণনা করছি:

১. সেক্যুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দা‘ঈ বা আহ্বানকারীদেরকে তারা নানাভাবে হেয় ও উপহাস করে, সরকারি চাকুরী ও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, যেন তারা জাতি ও যুবকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

২. সেক্যুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কাজই হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও দিগ্বিজয়ী ইসলামী আন্দোলনের ফসল স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জংগলীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

৩. সেক্যুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সেবাদাসরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের সেকুলার মতাদর্শের সেবক বানানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন:

> ক. শিক্ষা উপকরণ ও সিলেবাস দ্বারা ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করা।
>
> খ. ধর্মীয় শিক্ষার নির্ধারিত সময় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা ও সংকুচিত করা।
>
> গ. নির্দিষ্ট কতক ধর্মীয় বিষয় পাঠদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যে বিষয়গুলো সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে কিংবা সে মতবাদের ভ্রষ্টতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঘ. শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে বিকৃতি ঘটানো, যেন মানুষ বুঝে শরীয়ত সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে বুঝে যে, ইসলামের সাথে তার সংঘর্ষ নেই।

ঙ. পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালনকারী শিক্ষকদেরকে পাঠদান ও শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখা এবং ছাত্রদেরকে তাদের সাথে মিশতে না দেওয়া। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন দাফতরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা, অথবা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো পথে তাদেরকে মগ্ন করে দেওয়া।

চ. ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বহীন ও অতিরিক্ত বিষয়ের মান দেওয়া, যেমন শেষ পিরিয়ডে রাখা, যখন ছাত্রদের মাঝে ক্লান্তির ভাব সৃষ্টি হয়, যেন তারা ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত না হয়। আবার এমনভাবে এ বিষয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যে এর সাথে ছাত্রদের পাশ-ফেলের সম্ভাবনা না থাকা।

৪. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী ও মিথ্যা-বিকৃত দ্বীনের অনুসারী যেমন মুসলিম-ইয়াহূদী-খৃস্টান ও নাস্তিকদের থেকে পার্থক্য তুলে দেয়া, অতঃপর সবাইকে এক মানদণ্ডে রাখা ও বাহ্যিকভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা কাফের, নাস্তিক, পাপাচারী ও অপরাধীদেরকে তাওহীদের ধারক-বাহক, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ইমানদার লোকদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এ মতবাদের সামনে মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহূদী, ব্রাহ্মণ, মূর্তিপূজক সবাই সমান, তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তখনই তাদের কাছে মুখ্য হবে যখন কেউ তাদের মতবাদের আহ্বানে সাড়া দিবে। এ মতবাদের ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে খৃস্টান, ইয়াহূদী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা সমাজতন্ত্রীর সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে বৈধ, কোনো সমস্যা নেই, অনুরূপ তার দৃষ্টিতে মুসলিম দেশে ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান অথবা অন্য কোনো কুফরি ধর্মের অনুসারীর শাসক হতে সমস্যা নেই। তারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিম দেশের কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে তুলে দিতে চায়।

বরং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ ও দেশের অখণ্ডতাকে মূলনীতি ও একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হিসেবে দেখে। কুরআনুল কারীমের যে অংশ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস তাদের এ তথাকথিত জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ নীতি বিরুদ্ধ হয়, তাকেই তারা ছুড়ে ফেলে ও প্রত্যাখ্যান করে। আর বলে: এটা দেশীয় একতা ও ঐক্য বিনষ্টকারী!

৫. এ মতবাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করা এবং পারিবারিক সিস্টেম ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন:

ক. অশ্লীলতাকে বৈধতা দেওয়া ও তার জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা; যার দৃষ্টিতে ব্যভিচার ও সমকামিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি!

খ. শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ও সেগুলোর সহায়তায় নিয়োজিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা। কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে সেসব অশ্লীলতা প্রচারে রত থাকা।

গ. স্কুল-ভার্সিটি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে পর্দা নিষিদ্ধ করা এবং অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাকে চাপিয়ে দেওয়া।

৬. বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াত বাধাগ্রস্ত করা, যেমন:

ক. ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারণায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা, পক্ষান্তরে যেসব বই-পুস্তকের কারণে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামী ঈমান-আকিদা বিনষ্ট হবে ও শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হবে, সেগুলো অধিকহারে প্রকাশ ও বিতরণ করা।

খ. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বী লোকদের বিভিন্ন মিডিয়ায় সুযোগ দেওয়া, যেন তারা দেশের অধিকাংশ মানুষের সামনে তাদের পথভ্রষ্টতা প্রচার করার সুযোগ পায় ও শরীয়তকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়; পক্ষান্তরে যেসব আলেম মানুষের সামনে দ্বিনের হাকিকত তুলে ধরবেন তাদেরকে মিডিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়, অথবা ইসলামিক মিডিয়াগুলো বন্ধ করা হয়।

৭. সেক্যুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দা‘ঈদের হয়রানী করে বেড়ানো, তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন খারাপ বিশেষণে বিশেষায়িত করা; সমাজে প্রচার করা যে, তারা রক্ষণশীল, বিবেক প্রতিবন্ধী ও পশ্চাতমুখী; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা পোষণকারী, চরমপন্থি ও উগ্রবাদী, বাস্তবতা বুঝে না, তারা মূল বস্তু ত্যাগ করে খোসা ধরে রাখে ইত্যাদি।

৮. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, যেসব মুসলিম সেক্যুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে আপোষ করে না তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া, তাদেরকে দেশান্তর করে দেওয়া, অথবা জেলে দেওয়া অথবা হত্যা করা।

৯. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আবশ্যকতা অস্বীকার করা, জিহাদ নিষিদ্ধ করা এবং জিহাদকে একপ্রকার ডাকাতি ও বর্বরতা জ্ঞান করা। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করা, যেন পৃথিবীর বুকে ইসলামী হুকুমত ব্যতীত দাপুটে ও শক্তিধর কোনো হুকুমত না থাকে; পক্ষান্তরে সেক্যুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার সকল শাখা থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা। ধর্ম সম্পর্কে তাদের সবচেয়ে সুন্দর উক্তি হচ্ছে: "মানুষ ও তার উপাস্যের মাঝে ধর্ম বিশেষ এক বন্ধন, যার প্রভাব ইবাদতগৃহের বাইরে ব্যক্তির কথা, কাজ ও চরিত্রে প্রতিফলিত হবে না"। অতএব আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদের অনুমতি তাদের দৃষ্টিতে না-থাকাই স্বাভাবিক।

ধর্মনিরপেক্ষ ও তার অনুসারীদের নিকট সম্পদ ও ভূ-খণ্ড রক্ষা ব্যতীত যুদ্ধ করা বৈধ নয়; দ্বীনের সুরক্ষা, দ্বীন প্রচার ও তার বিজয়ের জন্য জিহাদ করা তাদের নিকট বর্বরতা ও সীমালঙ্ঘনের শামিল, যা সভ্য প্রগতিশীল মানুষের নিকট গ্রাহ্য নয়!

১০. তারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের দাওয়াত দেয়, তার ভিত্তিতে তারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখে। তাদের নিকট একতার মানদণ্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, অথবা ভাষা, অথবা ভূ-খণ্ড অথবা পার্থিব কোনো স্বার্থ; ধর্মের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাদের সংবিধানে বৈধ নয়, বরং দ্বিন তাদের দৃষ্টিতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির বড় কারণ। তাদের কেউ এমনও বলেছে: "রক্তাক্ত শতাব্দীগুলোর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, পরকালীন জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদার কথিত ধর্ম বা দ্বিন শান্তিকে ধ্বংস করেছে।"

এখানে সেক্যুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের জন্ম দেওয়া মুসলিম দেশে বিদ্যমান কয়েকটি কুফল উল্লেখ করলাম, বস্তুত তার কুফল আরো অধিক, আরো ব্যাপক।

কেউ দৃষ্টি দিলে এ সকল কুফল অথবা তার বেশিরভাগ কুফল অধিকাংশ মুসলিম দেশে অনুভব করবে বা স্বচক্ষে দেখবে। আরো দেখবে যে, মুসলিম দেশের গভীর পর্যন্ত এ সেক্যুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীয় শিকড় শক্তিশালী করেছে।

একজন মুসলিম তার ডানে-বামে মুসলিম অধ্যুষিত যে কোনো দেশের দিকে তাকালে খুব সহজে, বিনা কষ্টে ও অনায়াসে সেক্যুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার এক বা একাধিক কুফল দেখতে পাবে, বরং তার বিবিধ কুফল থেকে মুক্ত কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

দ্বিনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ

মুসলিমদের দাওয়াহ এবং কর্মকাণ্ড কি শুধু "ধর্মীয়" বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে?

সেক্যুলারিসমে ধর্মের অবস্থান ব্যক্তিগত অঙ্গনে সীমাবদ্ধ। সমাজ, শাসন, অর্থনীতির মতো সামষ্টিক বিষয়গুলোকে ধর্মের আওতার বাইরে রাখা সেক্যুলারিজমের অন্যতম মৌলিক অবস্থান। সেক্যুলার চিন্তায় "ধর্মীয়" মানেই মসজিদ, ঘর আর সীমিত কিছু আচারপ্রথার বিষয়।

কিন্তু এই কথাগুলো ইসলামের ক্ষেত্রে খাটে না। ইসলাম আমাদের শেখায় মানবজীবনের সব ক্ষেত্রকে ওহীর নির্দেশনা অনুযায়ী চালাতে। আর এর মধ্যে অবধারিতভাবেই শাসন, অর্থব্যবস্থা আর সামাজিক কাঠামোর মত বিষয়গুলো চলে আসে।

ইসলাম তাত্ত্বিকতার ধর্ম না, প্রয়োগের ধর্ম। স্রেফ তাত্ত্বিকভাবে একে বোঝা যায় না। এই দ্বিনের সৌন্দর্যকে সত্যিকারভাবে বুঝতে হলে দ্বিন আকড়ে ধরে বাঁচতে হয়। আধুনিকতা থেকে বের হয়ে আসা অর্থনীতি কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত তাত্ত্বিক শাস্ত্র তাই ইসলামে পাওয়া যায় না। তত্ত্বকথা, কাল্পনিক মডেল আর বাদ-মতবাদের বিশাল বিমূর্ত অট্টালিকা ইসলাম তৈরি করে না। কিন্তু তার মানে এই না যে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আলোচনা বা নির্দেশনা ইসলামে নেই।

এই ক্ষেত্রগুলোর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহ আমাদের কিছু নির্দিষ্ট বিধান এবং সীমানা ঠিক করে দেয়। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনগুলোর ব্যাপারে দেখিয়ে দেয় সমাধানের নানা পথ। ইসলাম আমাদের এমন কিছু মূলনীতি দেয় পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে যেগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা সম্ভব।
কাজেই ধর্মের জন্য সেক্যুলারিজমের বানানো ছোট্ট খাঁচার ভেতর ইসলামকে ঢোকানো যায় না। ধর্মের জন্য সেক্যুলারিজমের বানানো সীমানা আর দ্বীন ইসলামের সীমানা এক না। সমাজ, শাসন, অর্থনীতির মতো বিষয়গুলো মুসলিমদের জন্য দ্বীনের বাইরের কোন আলোচনা না। মুসলিমদের দাওয়াহ এবং কাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়গুলো চলে আসবে।

আকীদাহ, মাসায়েল, তাযকিয়াতুন নাফসের মত বিষয়গুলো যেমন ইসলামের অংশ। তেমনি সমাজ, শাসন, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি কিভাবে চলবে, এই আলোচনাগুলোও ইসলামের অংশ। আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর আলোচনা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে গতো আট-নয় দশক ধরে অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর আলোচনার দিকে খুব একটা মনোযোগী হয়নি বা হতে পারেনি। এর পেছনে

বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কারণ আছে। আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহর দেয়া সমাধানগুলো অবধারিতভাবে ইসলামী শাসনের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী শাসনকে বাদ দিয়ে এই সমাধানগুলোর আলোচনা অনেকটা গাছ না লাগিয়ে ফল আশা করার মতো।

তাছাড়া আধুনিক জাতিরাষ্ট্র এমন এক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে যা মৌলিকভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার ইসলামী সমাধানগুলো আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা অনেক সময়ই তাই স্ববিরোধী হয়ে পড়ে।

এসব কারণে ইসলামী আন্দোলনগুলো অল্প কিছু বিষয়ের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে। মুসলিমদের দাওয়াতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে কমেছে আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর উপস্থিতি। আজ দ্বীনি শিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালনের দাওয়াহ এবং সাদাকাহ-যাকাত সংক্রান্ত কিছু উদ্যোগের মধ্যেই আমাদের অধিকাংশ কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, একথা বললে ভুল বলা হবে না।

কারণ যাই হোক, সমাজের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নেতিবাচক। এর ফলে মানুষের চিন্তার জগতে নিজে থেকেই এক ধরণের বিভাজন তৈরি হয়ে গেছে। মানুষ ধরেই নিয়েছে অর্থনীতি, সামাজিক সমস্যা, শাসন, যুলুমের মোকাবেলার মত বিষয়গুলোর সমাধানের পথ হল সেক্যুলার রাজনীতি। এগুলোর জন্য যেতে হবে সেক্যুলার রাজনীতির পথে। আর ইসলামী ব্যক্তিত্ব বা সংগঠনগুলোর কাছে মিলবে কেবল "ধর্মীয়" বিষয়ের সমাধান।

আমরা নিজেরাও অনেক সময় এই বিভাজনকে শক্তিশালী করি। সমাজে আলিমদের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আমরা যেমন বলে ফেলি আলেমরা ছাড়া জানাযা পড়াবে কে?

অথচ আলিমদের ভূমিকা কিছু ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। তাদের দায়িত্ব এবং সম্মান আরো অনেক বিস্তৃত। কিন্তু আমরা নিজেরাই এসব কথা বলে তাঁদেরকে অনেকটা আচারসর্বস্ব পুরোহিতের জায়গায় নামিয়ে আনি। ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োগকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা থেকে।

এই ধরণের চিন্তার অবধারিত ফলাফল হল সমাজ ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রন সেক্যুলার শ্রেণীর হাতে চলে যাওয়া। গত আট-নয় দশকে উপমহাদেশে ঠিক তাই ঘটেছে। আর বিভিন্ন সেক্যুলার দল ও গোষ্ঠী তাদের আকীদাহ এবং এজেন্ডা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রকে চালিয়ে নিয়ে গেছে। আর্থ-সামাজিক বিষয়ে ইসলামের জায়গা থেকে কথা বলার সুযোগও দিন দিন কমে এসেছে।

অথচ ব্যাপারটা সবসময় এমন ছিল না। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন যখন ছিল, সেই সময়ের কথা নাহয় বাদই দিলাম, কলোনিয়াল দখলদারিত্বের সময়ও দ্বীনি ও দুনিয়াবি দু ধরণের ইস্যুকে ইসলামের ভিত্তিতে সমন্বয় করে আন্দোলনের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আর্থ-সামাজিক যুলুমের বিরুদ্ধে দ্বীনের ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত আছে আল-জাযায়েরী, আল-খাত্তাবী, ইমাম শামিলসহ আরো অনেকের আন্দোলনের মাঝে। আমাদের হাতের কাছেই আছে শহীদ তিতুমীর এবং ফরায়েজী আন্দোলনের দৃষ্টান্ত।
ইমাম সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত তিতুমীরের ইসলামী আন্দোলন ছিল একটি সফল কৃষক আন্দোলনও। অন্যদিকে আরবের নাজদী আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত হাজী শরীয়াতুল্লাহর তাজদীদি আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলার জনগণকে শিরক ও বিদআহ থেকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু একসময় এই আন্দোলন মনোযোগী হয় আর্থ-সামাজিক নানা বিষয়ের দিকেও। দুদু মিয়ার স্লোগান, 'লাঙ্গল যার, জমি তার', স্পষ্টতই নীলকর এবং জমিদারদের যুলুমের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক সমাজের মনোভাব মাথায় রেখেই তৈরি করা। আর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়টাতেই ফরায়েজী আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় পৌঁছে।

বাস্তবতা বলে "দ্বীনি-দুনিয়াবি" ইস্যুর এই বিভাজনকে টিকিয়ে রেখে ইসলামকে সামাজিক শক্তি হিসেবে দাড় করানো অত্যন্ত কঠিন। অধিকাংশ মানুষ আদর্শ বা আকীদাহ দ্বারা চালিত হয় না। ক্ষুধার্থ মানুষ, নয়টা-পাঁচটার রুটিনের যাতাকলে ক্লান্তশ্রান্ত মধ্যবিত্ত, চাইলেও কেবল আকীদাহর ওপর শক্ত অবস্থান নিতে পারে না।

এই মানুষগুলোকে কাছে টানতে হলে কথা বলতে হবে তাদের দুশ্চিন্তা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গাগুলো নিয়েও। বিপদের সময় তাদের পাশে দাড়াতে হবে।
পাশাপাশি ইসলামকে উপস্থাপন করতে হবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমাধান হিসেবেও। যাতে অর্থনীতি, সমাজ, শাসনের নানা সমস্যার বাস্তব সমাধান হিসেবে ইসলামের কথা চিন্তা করার প্রবণতা সমাজের মধ্যে তৈরি হয়। এই অঙ্গন সেক্যুলারদের জন্য ছেড়ে দিয়ে রাখলে সমাজ ও শাসনের নিয়ন্ত্রন তাদের হাতেই থেকে যাবে।

করনীয় ও বর্জনীয়

সেক্যুলারিজমের ব্যাপক প্রসারের ফলে মানুষ ইসলামকে কোনো এক ইবাদত, অথবা কোনো এক আদব অথবা কোনো এক অভ্যাসে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে ফেলবে, বরং অনেকের নিকট তো এখনই সালাত, সিয়াম ও কতক জিকিরের মাঝে ইসলাম সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। কেউ ইসলামকে সীমাবদ্ধ করেছে শুধু সদাচরণে। কারো নিকট বিশেষ অবস্থা অথবা বিশেষ আকৃতি অথবা বিশেষ পোশাকের নাম-ই ইসলাম। কারো নিকট কয়েকটি ফিকহি মাসআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ইসলাম, অথবা কিছু বিষয়-আশয় ও কিছু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় জানাই ইসলাম, ইত্যাদি।

আপনি যদি তাদেরকে ইসলামের ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতার প্রতি দাওয়াত দেন, তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন আল্লাহর তাওহীদ, আখিরাতের প্রতি ঈমান, আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফয়সালা করা ও তার শরীয়ত আঁকড়ে ধরা; অথবা ইসলামী খিলাফত পুনরুদ্ধার ও কায়েম করার আলোচনা এবং কুফরি মতবাদসমূহের বাতুলতা প্রকাশ করেন, যেমন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি, তাহলে তারা ভাববে আপনি ইসলাম ছাড়া অপর কোনো বিষয়ে আলোচনা করছেন। তারা বলবে, 'এটাই তো রাজনীতি, আর রাজনীতির সাথে দ্বিনকে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়।'

এ জাতীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকদের জন্য যদি সেসব বিষয় জুমার খুতবা, মসজিদের হালকা, বিভিন্ন সেমিনার ও ছোট ছোট কিতাবে প্রকাশ করা হত, যা পড়া ও বুঝা সহজ, তাহলে তাদের থেকে এরূপ বিচ্যুতিমূলক কথা কখনো বের হত না।

সেক্যুলার আধিপত্য ভাঙ্গা এবং ইসলামকে সামাজিক শক্তি হিসেবে হাজির করার জন্য অফলাইনের কাজ কেমন হতে পারে? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য কিছু উত্তর নিচে দেয়া হল-

ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে সচেতনতা/গবেষণা: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে কাজ করার জন্য "ক্লাব" বা "কেন্দ্র" তৈরি করা যেতে পারে।
এধরণের প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হবে কর্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং জনপরিসরে ঘটা ইসলামবিদ্বেষের ঘটনাগুলো নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা। সমাজে থাকা ইসলামবিদ্বেষের আদর্শিক শেকড় মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা। ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। এবং সাধ্যমত ইসলামবিদ্বেষের শিকার মুসলিমদের; বিশেষ করে আমাদের বোনদের পাশে দাঁড়ানো।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: বাংলা সাহিত্যে ইসলামবিদ্বেষ, সংবাদ ও সাংবাদিকতায় ইসলামবিদ্বেষ, পপুলার মিডিয়াতে ইসলামবিদ্বেষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামবিদ্বেষ, চাকরির নিয়োগে ইসলামবিদ্বেষ, "সুশীল সমাজের" বক্তব্যে ইসলামবিদ্বেষ – এই ধরণের বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করা যেতে পারে। পশ্চিমে এধরনের অনেক অ্যাকাডেমিক কাজ হয়েছে (বিশেষ করে ইহুদীবিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্য নিয়ে) সেগুলো থেকে আইডিয়া নেয়া যেতে পারে। জরিপ, গবেষণা প্রতিবেদন, আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, লিফলেটিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন, প্রতিকী প্রতিবাদসহ বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি সাধ্যমত এখানে কাজে লাগানো যেতে পারে।

লিগ্যাল এইড: খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব দুনিয়াতে কাজ করতে গেলে বাঁধাবিপত্তি আসবেই। অনেক ক্ষেত্রে হয়রানিমূলক গ্রেফতারি বা মামলার ভয় দেখানো হতে পারে। এছাড়া মিছিল থেকে গ্রেফতারের দৃষ্টান্তও আমরা দেখেছি। এসব ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা দেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ, খরচ, সমন্বয় এই ধরণের বেশ কিছু কাজ এখানে থাকে। আলিমদের তত্ত্বাবধানে তরুণ আইনজীবি ভাইরা এধরনের উদ্যোগ নিতে পারেন।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বা কর্মক্ষেত্রে ইসলাম পালনের জন্য বৈষম্য ও প্রশাসনিক হয়রানির শিকার মুসলিমদের আইনী সহায়তা দেয়া।

ইসলামী ইতিহাস: বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামী ইতিহাস নিয়ে আলোচনার জন্য ক্লাব/কেন্দ্র/সোসাইটি তৈরি হতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, বই পড়া প্রতিযোগিতা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি, উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাস, বাংলায় মুসলিম শাসন, আমাদের মুসলিম পরিচয়, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও আন্দোলন নিয়ে আয়োজন (বালাকোট, ফরায়েজী, তিতুমীর, পাটনা আন্দোলন, দেওবন্দ আন্দোলন ইত্যাদি)।

পাশাপাশি ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনারসহ বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি সাধ্যমত এখানে কাজে লাগানো যেতে পারে। এধরণের ম্যাটেরিয়াল নিয়ে মুসলিম ইতিহাসভিত্তিক পডকাস্ট বা ইউটিউব ভিডিও-ও বানানো যেতে পারে।

ইসলামী চিন্তা ও সভ্যতা: ইসলামী ইতিহাসের অনুরূপ। এখানে বিশেষভাবে সমাজ, সভ্যতা ও শাসন নিয়ে মুসলিম উলামা এবং চিন্তাবিদদের ধারনার ওপর ফোকাস করা যেতে পারে। আল-

গাযযালি, ইবনু খালদুন, ইবনু তাইমিয়াহ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ ইসমাইলসহ অতীত ও নিকটবর্তী অতীতের আরো অনেককে নিয়েই কাজ করা যেতে পারে। রাহিমাহুমুল্লাহ।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: ইসলামী ইতিহাসের অনুরূপ।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম: এ ধরণের কেন্দ্র/ক্লাবের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে আলোচনা হতে পারে সুদের ভয়াবহতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক ঋণের বাস্তবতা, ওয়াকফ-সাদাকাহ-যাকাতের আর্থসামাজিক সম্ভাবনা, দারিদ্র্য বিমোচনে করযে হাসানা ভিত্তিক মাইক্রোফাইন্যান্সের সফলতা ও সম্ভাবনা, ফিনটেকের সাথে সমন্বয় করে মুশারাকা-মুদারাবাসহ সাদাকা ও ওয়াকফের প্রয়োগসহ নানা বিষয় নিয়ে।

মনোদৈহিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম: ইসলামের আলোকে মনোবিজ্ঞান, আধুনিকতার তৈরি মানসিক সমস্যার সমাধানে তাযকিয়াতুন নাফস, তাসাউফ, কানা' (সন্তুষ্টি), যুহুদ, মুসলিম আলিমদের চিন্তার আলোকে মানসিক সমস্যার কারণ ও সমাধান-কাজ হতে পারে এধরনের বিভিন্ন টপিকে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: মনোদৈহিক ও সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নিয়ে আল-গাযযালি, ইবনুল জাওযী, ইবনুল কাইয়্যিম, আবু যাইদ আল-বালখীসহ বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তিদের চিন্তা ও গবেষণা নিয়ে আয়োজন। উবুদিয়্যাহর ধারণা নিয়ে আলোচনা। ডিপ্রেশন-সুইসাইড-অবক্ষয়ের সমাধানে ইসলাম, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, বুকলেট তৈরি, ডেইলি প্ল্যানার তৈরি, রমাদ্বান ও যুল হিজ্জার ইবাদাত উপলক্ষে বিশেষ ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যবাদ: ইসলামের প্যারাডাইম থেকে মডার্নিটি এবং এর মতবাদগুলোর খণ্ডন। বিশেষ করে সেক্যুলার জমিদারদের বহুল ব্যবহৃত মতবাদগুলোর খণ্ডন।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: বাছাই করা বই পড়া, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, খণ্ডনমূলক প্রবন্ধ, শর্ট কোর্স, আলোচনা, ওয়ার্কশপ, ইউটিউব ভিডিও, পডক্যাস্ট ইত্যাদি।

সামাজিক অবক্ষয়ের মোকাবেলায় ইসলাম: এধরনের প্ল্যাটফর্মের অধীনে বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। যেমন পর্নোগ্রাফি, যিনা/প্রেম, স্ক্রিন আসক্তি, পরিবারের ভাঙ্গন, মাদকাসক্তি ইত্যাদি।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: লিফলেটিং, আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, স্ট্রিট দাওয়াহ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, বিষয়ভিত্তিক বুকলেট ছাপানো, কিশোরতরুণদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচী, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন (খেলা কিংবা অন্যান্য) ইত্যাদি। এধরণের ম্যাটেরিয়াল নিয়ে মুসলিম ইতিহাসভিত্তিক পডকাস্ট বা ইউটিউব ভিডিও-ও বানানো যেতে পারে।
পড়াশুনা, ক্যারিয়ার এবং বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা যেহেতু বর্তমানের তরুণদের জন্য বড় একটা সমস্যা তাই ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস এবং ম্যারিটাল কাউন্সেলিং নিয়েও কাজ করা যেতে পারে।

ইলম: প্রাথমিক ইলম অর্জন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ক্লাব/কেন্দ্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: তাজবীদ শিক্ষা, প্রাথমিক আকীদাহ (তাওহীদ, ঈমান, কুফর, শিরক, বিদআহ, আল ওয়ালা ওয়াল বারা, নাওয়াকিদুল ইসলাম), ফারযুল আইন মাসায়েল, শরীয়াহর অপরিহার্যতা, তাযকিয়াতুন নাফস, সীরাত শিক্ষা, প্রাথমিক তাফসীর, চল্লিশ হাদীস, দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ পালন, উবুদিয়্যাহর ধারণা ও শিক্ষা, আরবী শিক্ষা, ইত্যাদি।

দাওয়াতী ও ইসলাহী প্ল্যাটফর্ম: ইসলামী অ্যাক্টিভিজম বলতে সাধারণত এধরনের কাজকেই বোঝানো হয়। ইসলাহী দাওয়াহর পাশাপাশি ওপরের অনেকগুলো কনসেপ্ট এই ধরণের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

এছাড়া শরীয়াহ শাসন এবং আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের বিষয়গুলো এধরণের প্ল্যাটফর্মে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ। দ্বন্দ্বমূলক মনোভাব, হুমকি-ধামকি, আলটিমেটাম ইত্যাদির বদলে নাসীহাহ, শিক্ষাদান, সতর্ক করার আদলে আলোচনা আসলেই উত্তম হবে।

পাশাপাশি ম্যাগাযিন ছাপানো, ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা, ইসলামী কবিতা, সেমিনার ও ইস্যুভিত্তিক অন্যান্য আয়োজন হতে পারে। প্রফেশানালরাও (অর্থাৎ যারা ছাত্র জীবন পার হয়ে এসেছেন) তা বিভিন্নভাবে এ ধরণের অ্যাক্টিভিজমের যুক্ত হতে পারেন। যারা সক্রিভাবে যুক্ত হতে পারবেন না তারা নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে এবং ফান্ডিংসহ অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এধরনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পারেন। চ্যারিটি এবং সমাজসেবামূলক বিষয়ে নিয়ে কাজ

করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও সামর্থ্য অনুযায়ী উল্লিখিত বেশ কিছু ফরম্যাটের কাজ তাদের নিজের প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করতে পারেন।

উল্লেখ্য এই কাজগুলো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ না। অর্থাৎ কেউ একটা করলে অন্যগুলো করতে পারবে না, ব্যাপারটা এমন না। সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী এক প্ল্যাটফর্মে উল্লিখিত একাধিক ধরণের কাজ হতে পারে।

আমরা আমাদের ও অধীনদের ক্ষেত্রে বাস্তব বিশ্বাসে বিশ্বাসী হব ও তার উপর আমল করব। এতেই ক্ষান্ত হব না, বরং মানুষদেরকে আহ্বান করব ও ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে বুঝাব। কিভাবে আমাদের শত্রুরা ভেতরে-বাইরে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করব। মুসলিম উম্মাহ বর্তমান কি পরিমাণ দুর্দশায় ভোগছে তাও তুলে ধরব তাদের সামনে। কোনো কষ্ট, বাঁধা ও বিরোধিতা আমাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখতে পারবে না। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী ও তার দোসররা আমাদেরকে কোণঠাসা করে কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমরা তার থেকে পিছপা হব না কখনো।

অবশ্যই আমাদেরকে দ্বীনের স্বার্থে দ্বীন মোতাবেক কাজ করতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের পছন্দনীয় আকিদা, কথা ও কর্মের উপর মানুষদের উঠাতে হবে, প্রয়োজনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, যেন ফিতনা দূরীভূত হয় ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার

সেক্যুলারিজম এমন একটি মতাদর্শ, যা ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমিত করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে। পশ্চিমা ইতিহাসে মধ্যযুগীয় খ্রিস্টীয় কর্তৃত্বের প্রতিক্রিয়ায় এই তত্ত্বের জন্ম হলেও, মুসলিম সমাজে এটি আরেক ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে। তা হলো—ইসলামের পূর্ণাঙ্গ, অভিভাজ্য কাঠামোকে ভেঙে অংশিক ও সীমিত আকারে উপস্থাপন করা। ইসলামের আকিদা, ইবাদত, নৈতিকতা, আইন, শাসন, সামাজিক কাঠামো—সব কিছুই একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। ইসলাম নিজেকে এমন একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করে, যেখানে আল্লাহর নির্দেশ মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এখানে স্পষ্ট হয়েছে যে, সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দাবি—রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে—বাস্তবে ধর্মকে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে পদ্ধতিগতভাবে বহিষ্কার করার নীতি হিসেবে কাজ করে। সে কারণেই আন্তর্জাতিক অভিধান, দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং বাস্তব প্রয়োগ—সব ক্ষেত্রেই সেক্যুলারিজম ধর্মহীনতার সাথে সম্পর্কিত। এর ফলে ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুশীলন প্রাধান্য পেলেও জনজীবন, আইন, শিক্ষা, পরিবারনীতিতে ধর্মের অবস্থান ক্ষীণ হয়ে পড়ে।
ইসলামি দৃষ্টিতে এটি শুধু একটি ভুল ধারণা নয়; বরং মানবজীবন ও সমাজসংগঠনের মৌলিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে। কারণ ইসলামের মতে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং জনজীবন আলাদা সত্তা নয়। ব্যক্তিগত আচরণ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—সবই একই মূল্যবোধ ও নীতির ধারাবাহিক প্রকাশ। গবেষণাটি দেখানো হয়েছে যে, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে, ধর্ম আসলে সমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং সেই সমাজে নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে।

উপসংহারে বলা যায়—সেক্যুলারিজম, তার দার্শনিক ভিত্তি এবং রাজনৈতিক প্রয়োগ, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ধারণার সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক। ইসলাম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে নিজস্ব বিধান ও নীতিমালার প্রয়োগ দাবি করে; অন্যদিকে সেক্যুলারিজম সেই দাবিকে বাতিল করে। তাই মুসলিম সমাজের জন্য জরুরি হলো—সেক্যুলার ধারণার উৎস, প্রকৃতি ও প্রভাব গভীরভাবে বুঝে নেয়া এবং একই সাথে ইসলামের সার্বিক ও অবিভাজ্য দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা ও ইসলামকে একমাত্র মনোনীত দ্বীন, একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে জয়ী করার লক্ষ্যে কাজ করা।

এই গবেষণা শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করে যে—

“ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত কিছু আচার-অনুষ্ঠানের ধর্ম নয়; এটি সমগ্র মানবজীবনকে পরিচালিত করার পূর্ণাঙ্গ এক দিকনির্দেশনা এবং সেই কারণে সেক্যুলারিজম ইসলামি চিন্তার পরিপন্থি এক দর্শন।”

তথ্যসূত্র

1. ডিভাইড বিটুইন ইসলাম এন্ড সেক্যুলারিজম - ড. ইউসুফ আল কারজাভি
2. হিউম্যান বিয়িং: শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব - ইফতেখার সিফাত
3. ইসলামের ব্যাপকতা - ড. ইউসুফ আল কারজাভি
4. https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=123
5. What is to be done? ইসলামবিদ্বেষ ও উগ্র সেক্যুলারিজম: বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের পরিচয়ের ভবিষ্যৎ - আসিফ আদনান